কালের পরিক্রমায়
বাংলাদেশ–বাঙালি ও বাংলা ভাষা
(১মঃ পর্ব)

(সুশীল জন গোমেজ)

প্রাক্কথন

হিম বা তুহিন যুগের সমাপ্তির পর পরই শুরু হয় প্রাচীন প্রস্তর যুগ এবং এই যুগেও বঙ্গলার বুকে বঙ্গালি জাতির বসবাস ছিলো। কিন্তু সে সভ্যতার লোপ পেয়েছে খ্রিস্ট পূর্ব বহু সতাব্দী আগে। কেননা প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ইহা ছিলো মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সমসাময়িক সভ্যতা। সুতরাং এ-বঙ্গলা দেশে মানুষের পদচারনা, যা কালের বিবর্তনে বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাঁদের খনন কার্য এবং নৃ-তাত্ত্বিক গবেষনা দ্বারা বঙ্গলার প্রাচীনত্বের কিছু তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে সক্ষম হয়েছেন এবং জীবাশ্ম পরিক্ষা ক'রে এ-সিদ্ধান্তে উপনিত হ'তে পেরেছেন যে, এখানকার মানব বসতি উপরোক্ত দু'সভ্যতার সমসাময়িক। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, এ-সব প্রাচীন মানব-মানবীই কি আমাদের আদি পিতা-মাতা? এ-প্রশ্নের জবাব নেই এবং এ-সংশয় চিরদিনই থেকে যাবে। কেননা এর কোনো লিখিত দলিলের সন্ধান আজতক্ উদ্ঘাটিত হয়নি।

বাঙ্গালীর ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় বিদগ্ধ ড: নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন, "একেবারে পুরানো পাথরের যুগ থেকেই এদেশে যে মানুষের বসবাস ছিলো তার তো অঢেল পাথুরে প্রমাণ ঢের আগেই আমাদের হাতে এসেছে। একথা জোর করেই বলা যায়, হিমযুগের পর থেকে এদেশ কখনই জন শূন্য থাকেনি।"

ঐতরেয় আরণ্যক ও পাণিনি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে যে, স্বাধীন বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখা যায় সেই দেশই ক্রমবিবর্তনে ইঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বঙ্গলা, হরিকেল এবং বিংশ শতাব্দীতে এসে প্রথমে পূর্ব বঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ নাম অর্জন করে বিশ্বের বুকে নিজের চিরস্বাধীন অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। যুগযুগান্তর ধরে ভারতের বুকের উপর কতো ঝড় বয়ে গিয়েছে, কতো সভ্যতার উদয় এবং বিলয় ঘটে গিয়েছে কিন্তু এই বঙ্গালদেশ বা বাংলাদেশের উপর স্থায়ীভাবে কোনোও জাতিরই সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। বাঙ্গালি জাতি সম্মিলিতভাবে তাদের দেশ, জাতি ও ভাষার অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। যার সাক্ষী আমাদের সার্বভৌম স্বাধীণ বাংলাদেশ। ভৌগলিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তার পূর্বের কাঠামো বদলে আজকের রূপ পরিগ্রহ করে নিয়েছে। আদি বাংলাদেশের গঠন ও আকৃতি বর্তমানের বাংলাদেশের মতো ছিলো না। নিম্নাঞ্চল উত্থিত হওয়ার পরই বাংলাদেশ ক্রিসেন্ট বা কাস্তে আকৃতি থেকে ডেল্টা বা বদ্বীপের আকার ধারণ করেছে।

খ্রীষ্ট পূর্ব ছয়-সহস্রাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল যেমন খুলনা, যশোর, বরিশাল, নোয়াখালী, ফরিদ পুর, কুমিল্লা ও ঢাকার নিম্নাঞ্চল সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত ছিলো। রাজমহল পর্যন্ত ছিলো সমুদ্রের বিস্তৃতি। সময়ের স্রোত-ধারায় গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং এ-দু'নদীর অজস্র শাখানদী বাহিত পলি দ্বারা এ-সব অঞ্চল ভরাট হয় এবং সাগর স্নাত বাংলা মা ধীরে ধীরে তৃণ-লতা-গুল্মে নিজেকে আচ্ছাদিত ক'রে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। খ্রীষ্ট জন্মের সমসাময়িক কালেও বাংলাদেশের এ-অঞ্চল মনুষ্য বাসের অযোগ্য ছিলো। এর অধিকাংশই ছিলো জলাভূমি এবং ঘন বন-জঙ্গল, লতা-গুল্ম ও বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং এদের শাখা নদী সমুহও বর্তমান অবস্থানে স্থিত ছিলো না। পর্যায়ক্রমে ইহারা উত্তর-পশ্চিম দিক হ'তে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সরে গিয়েছে এবং রেখে গেছে বড় বড় খাত। এ-খাত গুলিই হ'লো বর্তমান বিল-বাওর ও ঝিল।

বাঙ্গলা দেশের পরিসীমা

এই তো সেদিনের কথা, ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দেও অবিভক্ত বঙ্গদেশের পরিসীমা ছিলো অনেক বিস্তৃত। পশ্চিমে পূর্ণিয়া ও ছোট নাগপুর, পূর্বে শ্রীহট্ট (সিলেট), উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ ও দার্জিলিং এবং দক্ষিণে টেকনাফ ও বঙ্গপোসাগর।

এবং বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশের পরিধি হ'লো পশ্চিমে পদ্মানদী ও পশ্চিম-বঙ্গ, পূর্বে সিলেট, উত্তরে হিমালয় ও আসাম এবং দক্ষিণে টেকনাফ ও বঙ্গোপসাগর।

আয়তন ও পরিসংখ্যান

বাংলাদেশের আয়তন প্রায় ৫৬ হাজার বর্গ মাইল। এর লোক সংখ্যা প্রায় ১৫ কোটির মতো। কেননা ২০০১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় বাংলাদেশের লোক সংখ্যা ছিলো ১২ কোটি ৪৩ লাখ। এবং ২০১১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারিতে প্রাপ্ত জন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪ কোটিরও উপর। যার রেশিও হলো ১.৩৪ ভাগ। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা হলো ৭ কোটি ১২ লাখ ৫৫ হাজার এবং নারীর সংখ্যা হলো ৭ কোটি ১০ লাখ ৬৪ হাজার। তবে গনপ্রজাতান্ত্রীক বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী এ কে খন্দকার সাহেব বলেন, উপরোক্ত গণনার ফলাফলের ওপর বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান গণনা-পরবর্তী জরিপ চালাবেন। এ দু'টি ফলাফলের সমন্বয়ে প্রকৃত জনসংখ্যা বেড়িয়ে আসবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। ইতোপূর্বে বাংলাদেশে আরও পাঁচ বার আদমশুমারি অর্থাৎ লোকগণনা হয়ে গেছে, যেমন: ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১ ও ২০০১ সালে। শিক্ষাক্ষেত্রেও স্বাক্ষরতার ওপর জরিপ কাজ চালানো হযেছিলো যা জনগণের সুবিধার্থে তুলে দেয়া হলো। যেমন: ১৯৫১ সালে দেশে স্বাক্ষরতার হার ছিলো ১৮.৯ শতাংশ, ১৯৬১ সালে তা দাঁড়ায় ২০.৮ শতাংশে, ১৯৭৪ সালে উহা আরও বেড়ে ২৪.২৭ শতাংশে উপনিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ১৯৮১ সালে উহা হ্রাস পেয়ে ২৩.৮ শতাংশে নেমে আসে। ১৯৮৭ সাল পর্য়ন্ত এই হারটি অপরিবর্তিতই থেকে যায়। অর্থাৎ ১৯৫১ – ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত স্বাক্ষরতার হার ৫ শতাংশের উর্ধে তোলা যায়নি। তবে বিশ্বস্থ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, বর্তমানে স্বাক্ষরতার হার ৪০ শতাংশ অতিক্রম করে চলছে।

অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা আমাদের দেশ। এই দেশ শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেই ভরপুর ছিলো না, কৃষি, শিল্প, লোক-সংস্কৃতি, লোক-সাহিত্য এবং লোক-গীতিতে ভরা ছিলো বাংলা ও বাংলার লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার। এ দেশের নরম মাটির মতো নরম ছিলো এ দেশের মানুষের মন। এদেশের সম্বৃদ্ধি ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েই এতো বহিরাগতদের আনাগুনা ঘটেছে আমাদের দেশে। এতো লুণ্ঠন-ধর্ষণ-শোষণ-ত্রাষণ চলেছে আমাদের এই বাঙলার বুকে। অনেক পায়তারা চলেছে এ দেশকে শাসন করতে কিন্তু বাঙালির সম্মিলিত শক্তির কাছে তারা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে বারবার। কিন্তু ১৫'শ খ্রি: শুধু বাংলা নয় সারা ভারতবর্ষ রাহুগ্রাসে পতিত হয়ে মোঘলদের কুক্ষিগত হয়ে পরে। ১৫'শ থেকে ১৭৫৭ খ্রি: পর্যন্ত মোঘলরা রাজত্ব করে, ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রি: পর্যন্ত শাসন করে ইংরেজরা এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ খ্রি: পর্যন্ত শাসন ও ত্রাষণ চালায় পাকিস্তনীরা এই বাংলামায়ের বুকে। ১৯০ বছর ইংরেজের শাসনাধীনে এবং ২৩ বছর পাকিস্তানীদের পদানত ছিলো আমাদের বাংলাদেশ। ইংরেজরা সাধারণতঃ বাঙালিদের উপর ছিলো না'খোশ। তাই তাঁরা বাংলা এবং বাঙালির উন্নয়ন কল্পে তেমন কিছুই করেননি। বরং বাঙালিদের উপর চালিয়েছে শোষণ-ত্রাষণ, জোর-জুলুম, অন্যায়-অত্যাচার, লণ্ঠণ-ধর্ষণ ও হত্যা। এবং তাঁদের পোষা পদলেহনকারী জোতদার-জমিদাররা নীরিহ বাঙালি কৃষকদের করেছে ভিটে-মাটি হতে উৎখাত। এমনও শোনা গিয়েছে যে, খজনা পরিশোধ না করার মিথ্যে অভিযোগ এনে তাদের উপর চালিয়েছে নৃশংষ অত্যাচার। যার সাক্ষী বহন করে চলছে "নীল দর্পণ" গ্রন্থখানি। আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা সুপরিকল্পিতভাবে বাঙালি জাতিকে ধ্বংশ করার সরযন্ত্রে লিপ্ত থেকেছে সর্বক্ষণ। যারদরুন আমাদের মুখের ভাষা, মায়ের ভাষাকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য তারা সুপরিকল্পিতভাবে শিশু সাহিত্যে ও পাঠ্য বইপত্রে উর্দূ, আরবী ও ফার্সি শব্দগুলির স্থান করে নিচ্ছিলো। কেননা তারা জানতো একটা জাতিকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে হলে প্রথমই আঘাত হানতে হবে তার ভাষা এবং সংস্কৃতির উপর। তাদের এই বৈমাত্রীয়সুলভ মনোভাব প্রথম থেকেই বাঙালিরা লক্ষ্য করেছিলো, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলো যে, পশ্চিমা গোষ্ঠী কোনোভাবেই আমাদের আপন করে নিতে পারবে না। বাঙালিরাও তাই তাদের ওপর থেকে বিশ্বাস, প্রতীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও আস্থা হাড়িয়ে ফেললো, সৃষ্টি হলো পর্বতপ্রমাণ বৈষম্যের। এই বৈষম্যের প্রেক্ষিতেই এ দেশে গড়ে উঠেছিলো ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন এবং শ্লোগান ছিলো "আল্লাহু আকবর" ও "বন্দে মাতরমঃ" এবং "ইংরেজ হঠাও" নীতি গ্রহণ করে নিয়েছিলো তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণ ও বাঙালি শিক্ষিত সমাজ। ১৯৪৬ এর শ্লোগান ছিলো "হাত মে বিড়ি মু মে পান, লড়কে লিউঙ্গা পাকিস্তান।" এরপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিলো ভাষা আন্দোলন এবং শ্লোগান ছিলো "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই।" অতএব, সমগ্র বঙ্গলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে য়ে, এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গলা বা বাংলাদেশের চেহারা কতো করুণ, কতো ঘাত-প্রতিঘাত, শোষন-ত্রাষণ -এর মধ্য দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসে উপনিত হয়েছে। তারই কিছু খণ্ডচিত্র দেশবাসী ও অঞ্চলবাসীর জ্ঞাতার্থে তুলে ধরার প্রয়াস রাখি।

বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ

সমগ্র বাংলা দেশই হ'লো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। ষড়-ঋতুর আনাগুনা এখনো বাংলা দেশে পরিদৃষ্ট হয়। মৌসুমী বায়ু প্রবাহের জন্য বাংলা দেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। যারদরুন আমাদের বাংলা দেশ স্বর্ণ প্রসবিনী। বঙ্গ জননী হলেন প্রকৃতির ক্রীড়াঙ্গন। সারা বর্ষব্যাপী চলছে বাংলা মায়ের বুকের উপড় প্রকৃতির খেলা। কখনো মা আমাদের খররৌদ্রে দগ্ধ হোচ্ছেন, কখনো হোচ্ছেন সূচিসিক্ত, কখনো হাসিতে ভরিয়ে তুলছেন আমাদের হৃদয়, কখনো স্বর্ণালী রঙ ধারণ করে নবান্নের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন ঘরে ঘরে, কখনো হোচ্ছেন সুশীতল এবং কখনো তিনি অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে তাঁর প্রতি অঙ্গে জাগিয়ে তুলছেন আনন্দের সুর ও বন্যা। তাই তো আমরা মায়ের রূপে গর্বিত, মায়ের ধৈর্যে বিস্মিত, মায়ের আদরে লালিত, মায়ের স্নেহে পালিত। তাই আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি,

এমন মা হয না ভবে,
প্রনতি তাই তব পদে।

বাংলার নিম্নাঞ্চলগুলিতে জন বসতি স্থাপন

খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কীদের অতর্কিত আক্রমনে বাংলার নিরিহ মানুষ দিশেহারা হ'য়ে দিক্‌বিদিক্ ছুটতে থাকে এবং নিজেদের জান-মাল ও ইজ্জত রক্ষার্থে বাংলার নিম্নাঞ্চলে যেয়ে বন-জঙ্গল কেটে, বাঁশ, কাঠ, বেত, হোগ্লা,নল-খাগড়া দ্বারা গৃহ নির্মান ক'রে বসবাস শুরু করে। তখন এ-বন ছিলো হিংস্র শার্দুল, সরিস্রিপ ইত্যাদিতে ভরপুর। তাই তারা এ-সব প্রাণীদের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাতে আগুণ জ্বালিয়ে রাখতো এবং তার ধূয়া দিয়ে মশা ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গের উপদ্রব হ'তে নিজেদের রক্ষা করতো। "জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।" প্রবাদটা এখান থেকেই হয়তো সৃষ্ট। এমনি করেই আস্তে আস্তে এ-অঞ্চলে জনবসতি স্থাপিত হয়। গৃহ পালিত জীব জন্তুর মধ্যে হাঁস, মুরগী, গরু, মহিষ, ছাগল, শূঁকর ও কুকুর। কুকুরকে এরা শিকারের কাজে ব্যবহার করতো। পুরুষরা সারা দিন শিকার করতো এবং নারীরা ক্ষেতে-খামারে কৃষি কাজ করতো ও ঘর-গের্হস্থালি করতো। পরিবারের কর্তা ছিলো নারী এবং সন্তানরা মায়ের নামে পরিচিত হ'তো। এ-অঞ্চল যে ঘন বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিলো তা ফরিদপুরস্থ খানখানাপুর- এর বিরাট বনভূমি এবং আমাদের বিখ্যাত সুন্দর বনই তার সাক্ষ্য।

যে কোনো দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, রাষ্ট্রিয় বিপ্লব, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শোষণ-ত্রাষণ, ধর্মীয় জটিলতা, সাম্প্রদায়িকতা দেশের জনগনের ওপর যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনি দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, স্থাপত্য, শিল্প-কলার উন্নতি সাধনেও বিঘ্ন ঘটায় ভীষণভাবে। আমাদের বাংলাদেশ পাচীনকাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত উপরোক্ত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ক'রে আসছে। আজ বাংলা ভাষা পৃথিবীর বুকে চতুর্থ বৃহত্তম ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত। এবং সারা বিশ্ব আজ একুশের অহঙ্কারে গর্বিত। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা বর্তমান পর্যায়ে এসে উপনিত হ'তে পেরেছি। তাই বাংলা ভাষার গৌড়-অপভ্রংশ যুগ থেকে নব্য-যুগ অবধী একটা ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়ার প্রয়াস রাখি।

বংলা ভাষা

আমরা বাংলায় কথা বলি, বাংলা আমাদের বুলি। বাংলা আমাদের ভাষা, বাংলা আমাদের হৃদয়ের আশা। তাই আমরা বাংলায় গান গাই, বাংলায় স্বপ্ন দেখি। বাংলা মায়ের আঁচলতলে বসে কবিতার জাল বুনি। কখন কোন্ সময়ে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুরু হয় তা নিশ্চয় ক'রে বলা না গেলেও আনুমানিক ৬৫০ খৃ: হ'তেই বাঙালি তাঁর প্রানের ভাষা-মায়ের ভাষার চর্চা শুরু ক'রে, -নিজেদের অন্তরে লুক্কায়িত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আবেগ-আবেদনকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে। আমাদের প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও বিদগ্ধ পণ্ডিতগন বাংলা ভাষার স্তর গুলোকে সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন:-

এক : প্রাচীন যুগ	: ৬৫০ খ্রি:	:১২০০ খ্রি: পর্যন্ত
দুই : সন্ধি বা অন্ধকার যুগ	: ১২০০ খ্রি:	:১৩৫০ খ্রি: পর্যন্ত
তিন : মধ্য যুগ	: ১৩৫০ খ্রি:	:১৮০০ খ্রি: পর্যন্ত
চার : নব্য যুগ	: ১৮০০ খ্রি:	:বর্তমানকাল পর্যন্ত

খ্রিস্ট জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বে ইউরোপের মধ্যভাগ থেকে দক্ষিণ-পূর্বাংশ অবধী যে ভাষার প্রচলন ছিলো তা-ই হ'লো "হিন্দ–ইউরোপায়ন মূল ভাষা"। এই মূল ভাষার দু'টি ভাগ, (ক) 'কেন্তম' এবং (খ) 'শতম'। 'শতম' ভাগের চারটা শাখার একটা শাখা হ'লো ' আর্য,' এই ' আর্য ' শাখার আবার তিনটা উপশাখা রয়েছে। তার মধ্যে একটা হ'লো 'ভারতিক', 'ভারতিক' শাখার দু'টো প্রশাখার মধ্যে একটি হ'লো 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য', 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য' থেকে এ'লো 'আদিম প্রাকৃত', 'আদিম প্রাকৃতের' পাঁচটা উপ-শাখার মধ্যে একটি হ'লো 'প্রাচীন প্রাচ্য', 'প্রাচীন প্রাচ্য'র পাঁচটা উপশাখার মধ্যে একটা হ'লো 'গৌড় প্রাকৃত', 'গৌড় প্রাকৃত' থেকে এ'লো 'গৌড় অপভ্রংশ', 'গৌড়-অপভ্রংশের' তিনটা উপশাখার একটা হ'লো 'বঙ্গ কামরূপী', 'বঙ্গ কামরূপী' থেকে 'বাংলা' এবং 'আসামী'।

অনেকেরই ধারণা বাংলা ভাষার উৎপত্তি হ'লো সংস্কৃত থেকে। ইহা কোনোভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা 'অপভ্রংশ' থেকে হ'লো বাংলা ভাষার উৎপত্তি। সংস্কৃত হ'লো আদিম প্রাকৃতের সমসাময়িক ভাষা। বৈদিক ভাষা থেকে উৎপত্তি হ'লো সংস্কৃত। সংস্কৃত হ'তে কোনো ভাষার সৃষ্টি হয়নি। সংস্কৃত হ'লো সাহিত্যিক ভাষা। তাই সংস্কৃতকে সাধারণতঃ বলা হতো সান্ধ্যভাষা বা মৃতভাষা। পতঞ্জলি-বর্ণিত শিষ্ট সমাজে এর প্রচলন ছিলো, কিন্তু সাধারণ্যের মধ্যে তা প্রচলিত ছিলো না। বিবর্তন ধারা অনুযায়ী বলা যায় প্রাকৃত যুগের আগে প্রাচীন প্রাকৃত-যুগ এবং তৎপূর্বে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার যুগ। এই যুগে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কথ্যভাষার নাম আদিম-প্রাকৃত। এই সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা করে একথা স্বভাবতঃই বলা যায় যে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলার কোনো ব্যুৎপত্তিগত সাদৃশ্য নেই। এই মতের সপক্ষে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কতকগুলো শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করে প্রমাণ করেছেন যে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। শব্দগুলো হচ্ছে–

বপ্প>বাপ,
মাআ>মা,
বহিনী>বোন,
গোরূঅ>গরু,
মত্থঅ>মাথা,
হত্থঅ>হাত,
পাঅ>পা,
গচ্ছ>গাছ,
দিখ্খই>দেখে,
সুনই> শুনে, ইত্যাদি।

এমনিভাবে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বাংলার রূপ আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সংস্কৃতে এদের রূপ যথাক্রমে পিতা, মাতা, ভগিনী, গো, মস্তক হস্ত পাদ, বৃক্ষ, পশ্যাতি, শৃণোদি ইত্যাদি। এখানে জনগনের জ্ঞাতার্থে নব্য বাংলার একটা বাক্যের উদাহরণ দেয়া হলো। যেমন:–

"বাংলায়–	: তুমি আছ,
বাক্যটি সংস্কৃতে	: য়ুয়ংস্থ',
প্রাচীন প্রাকৃত বা পালিতে	: তুম্হে অচ্ছথ',
অপভ্রংশে	: তুম্হে অচ্ছহ',
প্রাচীন বাংলায়	: তুম্হে আছহ' এবং
মধ্য বাংলায়	: তোহ্মে বা তুহ্মি আছহ'।
প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা আদিম প্রাকৃতে এর কথ্যরূপ	: 'তুহ্মে আচ্ছথ'।"

(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ :– গ্রন্থকার আজহার ইসলাম-এর লেখার সূত্র ধরে।)
এই কারণে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন– 'বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা নয়, তবে দুর সম্পর্কের আত্মীয়া'।

এই বাংলা ভাষার উৎপত্তি নিয়ে বিদগ্ধ পন্ডিতদের মধ্যে বেশ মতানৈক্য রয়েছে। মহামহীম জর্জ গ্রীয়ারসন এবং ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষা মাগধী প্রাকৃত হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছে ব'লে মত পোষণ করেন। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে গৌড় অপভ্রংশ হ'তে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। তাঁর মতে অপভ্রংশের আরম্ভকাল হ'লো পাঁচ'শ খ্রিষ্টাব্দেরও পূর্বে।

অপভ্রংশ

প্রথমেই বলা হ'য়েছে অপভ্রংশ থেকেই বাংলার উৎপত্তি। তবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে "অপভ্রংশ হ'তে প্রথমে উৎপন্ন হয় বিহারী। কিন্তু এ ভাষা পৃথক হ'য়ে যায়। পরে উড়িয়া ও বঙ্গ-কামরূপী ভাষা উৎপন্ন হয়। বঙ্গ-কামরূপী ভাষার বিচ্ছিন্ন রূপই হ'লো বাংলা ও আসামী"। বাঙালি কবিদের মধ্যে দু'জন সহজ-পন্থী সিদ্ধাচার্য কবি হ'লেন কাহ্ন পাদ এবং শরহ। এঁরা গৌড়-অপভ্রংশের কিছু দোহাকোষ রচনা করেন। এই অপভ্রংশ রচনায় বাংলার তৎকালীন ধর্মসাধন তত্ত্ব ও দার্শনিক মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরন:-

এক : "ঘরহি ম থক্কু ম জাহি বণে জহি তহি মণ পরিআণ।
সঅলু নিরন্তর বোহি-ঠিঅ কহিঁ ভব নিব্বাণ।।" (শরহ)

অনুবাদ:- ঘরে থেকো না, বনেও যেও না। যেখানেই থাকো, মনকে ভালো ক'রে জেনো। সকল (মন) নিরন্তর জ্ঞানে থাকলে কোথায় সংসার, কিংবা কোথায় তা থেকে মুক্তির ভাবনা?

দুই : "সহজ এক্কু পর অথি তহি কাণ্হ ফুড পরিজাণই।
সথাগম বহু পঢই সুণই বঢ কিম্পিণ জাণই।।" (কাহ্ন পাদ)

অনুবাদ:- সহজ আছে একের উপরে; তথায় কাহ্ন স্পষ্ট অবগত আছেন। মুর্খ বহু শাস্ত্র পাঠ করে ও শ্রবণ করে, অথচ কিছুই জানে না।

উপরোক্ত দু'টো উদাহরণ থেকে স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় যে, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলার মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। বাংলা কবিতার শেষে মিল বা অন্তানুপ্রাস সৃষ্টি এসেছে অপভ্রংশ থেকে।

গৌড় অপভ্রংশ	বাংলা
: বুদ্ধ ঘোড়অ দেকখই	: বুদ্ধ ঘোড়া দেখে
: রামকেরী বাড়ীও বহুত গচ্ছা আচ্ছন্তি	: রামের বাড়িতে বহুত গাছ আছে
: বহিনী ঘরে গইল্লী	: বোন ঘরে গেল
: এহু গচ্ছে বড্ডে	: এই গাছ বড়
: মঅঁ তেন্তিলী খাইল্লী	: আমি তেঁতুল খাইলাম।

গৌড় অপভ্রংশের নিদর্শন মিলে কাহ্ন এবং সরহের দোহাকোষে। এঁরা দু'জন ছিলেন সহজপন্থী সিদ্ধাচার্য। এঁদের অপভ্রংশ রচনায় প্রকাশ পেয়েছে ধর্মসাধনার জটিল তত্ত্ব। এসব রচনা থেকে আমরা বাংলার তৎকালীন ধর্মসাধন তত্ত্ব ও দার্শনিক মতবাদের পরিচয় পাই। এ দু'জন বাঙালি কবি বহু অপভ্রংশের দোহাকোষ রচনা করেছেন। যেমন:–

১ : ব্রহ্মণেহি ম জানন্ত হি ভেউ।
এবই পঢি-অউ এ চ্চউবেউ।।
মট্টী পাণী কুস লই পঢন্তঁ।
ঘরহিঁ বইসী অগ্নি হুনন্তঁ।।
কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ।
অক্খি ডহাবিঅ কড়ুএঁ ধূমেঁ।।

অনুবাদ: ব্রাহ্মণগণ রহস্য জানেন না, এইভাবে চতুর্বেদ পড়া হয়। মাটি, জল এবং কুশ নিয়ে তাঁরা পড়েন। ঘরে বসে অগ্নিতে হোম দেন। অন্য কাজ না থাকায় অগ্নিতে হোম করে কটু ধূমে চোখ দগ্ধ করেন।

"প্রাকৃত পৈঙ্গল" নামক ছন্দ-আলোচনার একখানি গ্রন্থ আনুমানিক খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকে রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থের কিছু কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি, আচার-আচরণ, নিষ্ঠা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি এমনভাবে প্রস্ফুটিত

হয়েছে যে, সহজেই অনুমিত হওয়া যায়, কবিতাগুলি বাঙালি কবিদের রচনা। ইহাই আমাদের গর্ব যে, গৌড় অপভ্রংশের যুগেও আমাদের এসব কবিরা ছিলেন দার্শনিক তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক গুণে গুণান্বিত। যেমন:

২: ণব মঞ্জরি সজ্জিঅ চুঅঅ গাছে, পরিফুল্লিঅ কেসু ণআ বণে আছে।
জই এথি দিগন্তর জাহিই কন্তা, কিঅ বম্মহ ণথি কি ণথি বসন্তা।।

অনুবাদ: আম্রবৃক্ষে নবমঞ্জরী সজ্জিত হয়েছে, বনে নতুন কিংশুক প্রস্ফুটিত আছে। এখান থেকে যদি কান্ত দিগন্তের (প্রবাসে) যায়, তবে কি মন্মথ নেই, বসন্তও নেই।

চর্যাপদ

কখন, কিভাবে, কেমন ক'রে, সাগরের কল্লোলিত নীলাম্বু-লহড়ীর ন্যায় এই ভাষা, এই গান, এই সুর, এই ছন্দ বাঙালি মনে আলড়ন সৃষ্টি ক'রে, তা পাথরে, পত্রে ও চর্মে লিখা হ'লো, কতো সহস্র বছর সময় ধ'রে এসব লিখা হ'লো, কে-ই বা লিখলো, সেসব ঋষি-সাধকদের, আবিষ্কারকদের নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ নেই এ বাংলার বুকে। শুধু র'য়ে গেছে স্মৃতি-বিজুরীত তাঁদের সেসব সৃষ্টি-সুধা। আর্য, অনার্য, কোল,মুন্ডা, চের, চীনা, তিব্বতী, কিরাত, নিষাধ, কোচ, মেচ, মগ, মিশ্‌মিরদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর বসন্তের সমীরণের ন্যায় বাঙালি মনে দোলা দিয়ে মনকে ক'রেছে হিল্লোলিত সহস্র বছর ধ'রে। দার্শনিক তত্ত্বে সম্বৃদ্ধ, আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ এবং ভাষার লালিত্য ও সৌকর্যে রচিত চর্যাকারদের চর্যাগীতি ও চর্যাকবিতাগুলি যে আঙ্গিকে গ্রন্থিত হয়ে মানব মনে প্রভাব বিস্তার করেছে তার সৌরভই বাংলা ভাষাকে সৌরভিত করে এসেছে যুগযুগ ধরে। যার বদৌলতে বাংলা ভাষা আজ পৃথিবীর বুকে শক্তিশালী ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। যেমন:-

"উমত শবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর শিহর সন্ধি পইসন্তে
শবরো লোড়িব কই সে।। (চর্যা ২৮, শবর পাদ)

অর্থাৎ গুরুর রোষে শবর উন্মত্ত হ'লো। গিরিবর শিখর সন্ধিতে প্রবেশ করলে সবরকে আর কোথা খোঁজা যাবে।" রাবিন্দ্রীক লেখনীতেও সেই একই সুর খুঁজে পাই। যেমন:- "প্রকৃতই তো এই সংসারের পাষাণ প্রাচীরে মাথা কুটিয়া মরিলেও একটুখানি সরুপথ কেহ যে আমাকে দেখাইয়া দিবে না। বোবা পথ কথা কয়না।" এসব বাণী চিরন্তন, অমর ও অক্ষয়।

বাংলা সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন হ'লো চর্যা। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে চর্যা পদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেহ অবহিত ছিলেন না। এ সময়েই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থশালা হ'তে কিছু সংখ্যক অপভ্রংশ দোহার সঙ্গে চর্যাপদের এক প্রাচীন পুঁথি আবিস্কৃত হ'য়েছে। তাঁরই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক চর্যাপদগুলো প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শণ হিসেবে এসব পদগুলোর মূল্য অপরিসীম। তারই দু'টো উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হ'লো।

: চর্যা :	: আধুনিক বাংলা পদ্যে-রূপান্তর :
নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।	: লো ডোমনী তোর নগর-বাইরে ঘর,
ছোই ছোই জাহ সো বাম্‌হণ নাড়িআ।।	: নেড়া বামুন আমায় স্পর্শ কর।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মো সাঙ্গ।	: আ লো ডোমনী তোরে আমি সাঙ্গা করবো ঠিক,
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ।।	: জাত বাছে না কানহু সে যে নগ্ন কাপালিক।
এক সো পদমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ি।	: একখানি সে পদ্ম আছে চৌষট্টিটা পাপড়ি,
তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ি।।	: তার উপরে ডোমনী নাচে, কী নৃত্য তার বাপ রে!
হালো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে।	: ডোমনী তোরে প্রশ্ন করি, সত্যি করে বল,
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহেরি নাবেঁ।।	: কার নায়ে তুই এপার-ওপার করিস চলাচল?
তান্তি বিকণহ ডোম্বি অবর মো চাঙ্গিড়া।	: আমার কাছে বিক্রি করিস চাঙাড়ি আর তাঁত,
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড় পেড়া।।	: নটের পেটরা, তোর জন্যেই, দিই না তাতে হাত।
তুলো ডোম্বি হউঁ তাপালী।	: তোর জন্যেই, হ্যাঁ লো ডোমনী, তোর জন্যেই যে

তোহোর অন্তর মো ঘালিলি হাড়েরি মালী।।	: এই কাপালিক হাড়ের মালা গলায় পরেছে।
সরবর ভাঙ্গিঅ ডোম্বি খাহ মোলাণ।	: পুকুর খুঁড়ে মৃণাল-সুধা করিস ডোমনী পান–
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ।।	: ডোমনী তোরে মারবো আমি, নেবো রে তোর প্রাণ।
(চর্যা-১০, কাহ্নু)	(অনুবাদ: সুব্রত অগাষ্টি গোমেজ)

: চর্যা :	: আধুনিক বাংলা পদ্যে-রূপান্তর :
"তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।	"পার ক'রে দেই তিনটি ভুবন অবহেলায়
হাঁউ সুতেলি মহাসুখ লীড়ে।।	সুপ্ত থেকে মহাসুখের মহালীলায়।
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরি আলি।	ডোমনী রে তোর চতুরালির পাইনা কোনঠিক,
অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী।।	পিছনে তোর কুলীন জন মধ্যে কাপালিক!
তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটলিউ।	বিচলিত করলি ডোমনী সবকিছুকেই,
কাজণ কারণ সসহর টালিউ।।	চাঁদটিকে তোর টলিয়ে দেওয়ার কারণ তো নেই।
কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।	বহু লোকে নষ্টা যদিও কয় তোরে
বিদুজণ লোঅ তোরেঁ কণ্ঠে ন মেলঈ।।	জ্ঞানীজনে রাখে গলার হার ক'রে।
কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী।	কানু বলে, কামাতুরা রে চন্ডালী,
ডোম্বি ত আগলি নাহি চ্ছিনালী।।"	বিশ্বমাঝে তোর বাড়া আর নাই ছিনালি।"
(চর্যা ১৮, কাহ্ন পাদ)	(অনুবাদ : সুব্রত অগাষ্টিন গোমেজ)

অন্ধকার যুগ : ১২০০ খ্রিঃ ..... ১৩৫০ খ্রিঃ

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কীদের আক্রমনের ফলে বাঙালির জীবনে নেমে আসে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তা। বাঙালিদের ওপর চলতে থাকে অকথ্য উৎপীড়ন-নিপীড়ন, ধর্ষণ-লুণ্ঠন এবং হত্যা। বাঙালিরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য দিশেহারা হ'য়ে পরে। তুর্কীদের হাতে মগধ ও নদীয়ার পতন ঘটার পর সেখানকার মঠ ও মন্দিরগুলো লুণ্ঠিত হ'তে থাকে। বৌদ্ধভিক্ষু শ্রমণগণ শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুঁথিপত্রাদিসহ তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, চীন ও কাশ্মীরে পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা করেন। রাজনৈতিক অরাজকতায় দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় নেমে আসে তাতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একটা গোটা অংশ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে। তুর্কীদের আমলে বাংলা দেশে কোনো কবি, সাহিত্যিক ছিলেন না। যাঁরাও ছিলেন তাঁরা ছিলেন পলাতক। সেজন্যই তুর্কীযুগের বাংলায় কোনো সাহিত্য সৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায় না। এ সময়টাই ছিলো বাংলার জীবন ও সংস্কৃতির তমসাচ্ছন্ন কাল। এই ১৫০ বছর সময়কালই হ'লো বাংলা সাহিত্যের "সন্ধি যুগ বা অন্ধকার যুগ"। তুর্কী আমলের ধ্বংস-চিত্র হিসেবে যা পাওয়া যায় তা হ'লো তুর্কী শাসনের পরবর্তীকালে রচিত নয়তো স্মৃতি থেকে উৎসারিত। এই সময়ে বাঙালি বৌদ্ধদের ওপর কুলীন ব্রাহ্মণরা যে, অত্যাচার করেছেন তার কিছুটা "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক কবিতাংশে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। যেমন :-

ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস হেতু নিরঞ্জন।
সাম্বাইল জাজপুরে হইয়া যবন।।

এই কবিতার দ্বারা স্পষ্টই প্রমানিত হয় যে, তুর্কী আমলের প্রাক্কালে হিন্দু কুলীন ব্রাহ্মণগণও বাঙালি বৌদ্ধদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার ক'রেছে। বাংলা সাহিত্যের বিপর্যয় এখানেই শেষ নয়। ১৭৫৭ খ্রষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা হারায়, তখন দেশে ভীষণ অরাজকতা দেখা দেয়। যারদরুণ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব-কাল অবধি সময়ে তেমন কোনো সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেনি। এর কারণও ঐ রাষ্ট্রিয় বিশৃংখলা। এ প্রসঙ্গে বিদগ্ধ সাহিত্যিক জনাব আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ "তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্য পরিক্রমা' নামক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,– 'পলাশীর প্রান্তরে আমাদের কপাল পোড়া যাওয়ার পর আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টির পথ প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া রুদ্ধ ছিলো। সামাজিক অধঃপতন ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ই ইহার মূল কারণ। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক আদর্শানুসারেই সাহিত্য সৃষ্টি হয়। এ সবের পারিপার্শ্বিকতা এড়াইয়া মানুষ চিন্তা করিতে পারে না। বাস্তব-নিরপেক্ষ কল্পলোকে মানুষের বিহার একরূপ অসম্ভব। এই কারণে (এই) শত বর্ষকাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শূন্য-যুগ'।"

কুলীণ ব্রাহ্মণগণ এবং উচ্চবর্ণের গোড়া হিন্দুদের দ্বারা বাংলা ভাষা উপেক্ষিত হ'য়ে আসছিলো কল্পনাতীতভাবে। তাঁরা সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্যকে পাত্তা দিতেন না। যারদরুন বাংলা সাহিত্য, সাহিত্য মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়নি। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রসারের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের অবদান অপরিসীম। বাংলা ভাষা যখন সাহিত্যের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি, তখন ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে সিদ্ধাচার্যগণই বাংলাকে সাহিত্যের ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের এই দুঃসাহসীক প্রচেষ্টাই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে আজকের দিনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হ'য়েছে।

জয়দেব ও গীতগোবিন্দ কাব্য

১০২৬ খ্রিঃ পাল রাজত্বের পতন ঘটে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পাল রাজত্ব চলাকালীন সময়ে বাংলা ভাষা সাহিত্য ভাষার স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়নি নানা কারনে। সেনেরা ছিলেন ভিন্ন ভাষার লোক সুতরাং বাংলা ভাষার প্রতি এঁদের কোনো আকর্ষণ ছিলো না। উপরন্তু তদসময়ে ধর্ম-কর্মে, সাহিত্য রচনায় সংস্কৃত ভাষার প্রচলন থাকাতে জনগণ একেই দেব-ভাষা হিসেবে মর্যাদা দান করতেন। কবি-সাহিত্যিক ও পদকর্তাগণও তখন সংস্কৃত ভাষাতেই তাঁদের সাহিত্য রচনা করতে বাধ্য হতেন। তবে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যের ছন্দ-প্রয়োগ এবং অলঙ্কার-প্রকরণকে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে আনুমানিক ১২শ খ্রিঃ তুর্কী আক্রমণে বাংলাদেশে চলতে থাকে অরাজকতা, মারামারী, কাটাকাটি, লুণ্ঠন, ধর্ষষ। বাংলার জনজীবনে নেমে আসে এক অনিশ্চয়তা। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দিক্‌বিদিক ছুটতে থাকে একটু নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। তাই ১২০০ খ্রিঃ থেকে ১৩৫০ খ্রিঃ পর্যন্ত এই ১৫০ বৎসর সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের কোনো বিকাশ ঘটে নি। উপরন্তু আর্য ব্রাহ্মণগণ এবং প্রভাবশালী গোড়া হিন্দুগণ বাংলা ভাষাকে কোনো মূল্যায়ন করতো না। বরং তাঁরা বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের নিয়ে বিদ্রুপ ও ভ্রুকুটি করতো। বাঙালিদের তাঁরা মানুষ হিসেবেই স্থান দিতো না। বাঙালি ঐতিহ্যকে খর্ব করার জন্য তাঁরা বিদ্রুপ করে বলতো যে, বাঙালিরা চি চি শব্দ করে কথা বলে। অর্থাৎ বাঙালিরা পশু-পক্ষি জাতীয় কোনো কিছু হবে। তাই সেন রাজত্বের পর আলাউদ্দিন হুসেন শাহর সময়ে বাংলা ভাষা যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করে এবং বৌদ্ধ সিদ্ধাচর্যগণই বাংলা ভাষাকে সাহিত্য ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। (অন্ধকার যুগের অন্তে এ বিষয়ে লেখা হয়েছে)।

গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রতিটি ছত্র অপূর্ব ধ্বনিমাধুর্যে পরিপূর্ণ। সংস্কৃত ভাষার লালিত্যকেও কবি তাঁর কাব্যে সযত্নে প্রস্ফূটিত করে শিল্পকলার সুক্ষ্ম শিল্পসৌকর্যকে লোক সম্মূখে প্রদর্শণ করতে সক্ষম হয়েছেন। গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রায় প্রতিটা অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, তিনি অতি কুশলে শব্দ-ছন্দ- ভাব ও অর্থের নৈপুন্য ঘটিয়ে মানব হৃদয়ের সূক্ষ্ম ও কোমল অনুভূতিকে জাগ্রত করেছেন। এবং রাধা-কৃষ্ণের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনামূলক ও সম্ভোগের আকর্ষণমূলক পদগুলোকে সরল ও সরস কাব্যচিন্তায় এবং শিল্পকলায় নান্দনীক রূপ দিয়েছেন। যেমনঃ–

অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশাল্।
স্বহৃদয়মর্ম্মনি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজাল্ম।।

বঙ্গ ভাষান্তরিত রূপঃ

রাধিকা নিজ বক্ষে অনবরত বর্ষিত মদন-শরাঘাত হইতে হৃদয়-মধ্যস্থিত তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই বর্ম্মস্বরূপ সজল আয়ত নলিনীপত্রে বক্ষ আচ্ছাদন করিযাছেন।

(হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত, বৈষ্ণব পদাবলী)

অন্যত্র :

স্তনবিনিহিতমপি হারমূদারম্।
সা মনরুতে কৃশততনুরিব ভারম্।।
রাধিকা তব বিরহে কেশব।।

বঙ্গ ভাষান্তরিত রূপ :

কেশব, তোমার বিরহে রাধা এমনই কৃশাঙ্গী হইয়া পড়িয়াছেন যে, স্তনোপরি বিন্যস্ত মনোহর হারকেও ভার বোধ করিতেছেন।

(ঐ)

রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-লীলার প্রকাশে কবি জয়দেবের ব্যবহৃত ভাষা অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ :–

১ : হরিপরিরম্ভণবলিতবিকারা।
কুচকলসোপরি তরলিতহারা।।

২ :বিচলদলকললিতাননচন্দ্রা।
তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা।।

৩ :চঞ্চলকুণ্ডললললিতকপোলা।
মুখরিতবসনজঘনগতিলোলা।।

৪ :দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা।
বহুবিধকুজিতরতিরসরসিতা।।

৫ :বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা।
শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গা।।

৬ :শ্রমজলকণভরসুভগশরীরা।
পরিপতিতোরসিরতিরণধীরা।।

বঙ্গ রূপান্তরিত রূপ :

১ : শ্রীহরির আলিঙ্গনে পুলক-চাঞ্চল্যে তাহার কুচকলসের উপর হার লীলায়িত হইতেছে।।

২ : তাহার ললিতমুখচন্দ্রে অলকদাম বিচলিত হইয়াছে এবং শ্রীহরির চুম্বন-রভসে তন্দ্রাতুর নয়ন দুইটি মুদিয়া আসিতেছে।।

৩ : তাহার ললিতকপোলে কুণ্ডল দুলিতেছে এবং জঘন-চাঞ্চল্যে মেখলা মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

৪ : প্রিয় দয়িতকে দেখিয়া সে কখনও লজ্জিতা হইতেছে, কখনও হাসিতেছে, কখনও বা রতিরসে মাতিয়া বহুবিধ অস্ফুট ধ্বনি করিতেছে।।

৫ : সে কখনও বিপুল পুলকে ঘন ঘন কম্পান্বিতা হইতেছে এবং ঘনশ্বাসে ও নিমীলিত নয়নে অনঙ্গরঙ্গ প্রকাশ করিতেছে।।

৬ : ভাগ্যবতীর দেহ শ্রমজলে পূর্ণ হইয়াছে এবং সেই রতিরণকুশলা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে লুটাইয়া পড়িতেছে।।

কবি জয়দেব, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার কুণ্ঠাহীন বর্ণনা এবং নিরাবরণ প্রাকৃত প্রেমের যে নিদর্শণ তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যে তুলে ধরেছেন তা জনগণের হৃদয় ছুঁয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং এ ছাড়াও গীতগোবিন্দের জনপ্রিয়তার আর একটি উৎস হলো তাঁর কাব্যে অনুপ্রাস-অলংকৃত ও সুরলয়-সমৃদ্ধ সুললিত ভাষার প্রয়োগ বিধি। যেহেতু তিনি সংস্কৃত ভাষার একজন পণ্ডিত ছিলেন তাই তাঁর সংস্কৃত ভাষাকে দলিত-মথিত করে তার মধ্য হতে তিনি ননীর মত করে সুকুমার ও নান্দনীক বিষয়গুলিকে টেনে এনে তাঁর বাংলা গীতগোবিন্দ কাব্যকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে কাব্যিক রূপ দিয়েছেন । যাকে বাংলার কোনো পদকার, কবিগণ অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হন নি। তাই বলা যায় গীতগোবিন্দ কবিতাই হলো রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলার আদি উৎস।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শণ হ'লো চর্যা এবং দ্বিতীয় নিদর্শণ হ'লো শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। প্রত্নতত্ত্ব বিশারদগণ অনুমান করেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হ'য়েছিলো। তা রচনাকাল যাই হোক না কেন তা নিয়ে আমার ততটা ভাববার বিষয় নয়। আমার উদ্দেশ্য হ'লো বাংলা ভাষা অপভ্রংশের পর থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ক্রমান্যয়ে কীভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হ'য়ে বর্তমাণ যুগে এসে উপনিত হ'য়েছে। যেমন, মধ্যযুগের আদিপর্বের বাংলা সাহিত্যের ভাষা ও ভাব কেমন ছিলো, তার দুটো উদাহরণ :-

১ : শ্রীরাধার রূপ দর্শণে শ্রীকৃষ্ণের বিগলিত হৃদয় কেমন উতলা হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাধিকার রূপ বর্ণনায় অধীর হয়ে উঠে। বড়ু চণ্ডীদাসের নান্দনীক শব্দসংযোজনা ও অলঙ্করণ আমাদের মনে মুর্ত হয়ে ভাবাবেগে মোহিত করে তুলে। যেমন-

নীল জলদসম কুন্তল ভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা।।
শিশত শোভএ তোর কাম-সিন্দুর।।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সুর।।
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডল-মণ্ডিত চারু শ্রবণাযুগলা।।

২ : শ্রীরাধার তনু-মন-প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় উতলা। তিনি আজ বেদনা বিদুর, তাঁর মনের গতি দেবতা নেমিসিসের ভয়ে আকাশের তারকারাজির মতো দিক্‌বিদিক্ ছোটাছোটি করছে। তাই তাঁর প্রিয়তমা সহিলীর কাছে পাগলপারা মনের আর্তি বয়ান করে মনের প্রশান্তি খুঁজে ফিরছে। যেমন:–

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।।
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমুতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমনি হোক সে।।

কবি চন্ডীদাসের এ কবিতা থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যে ঐ যুগেও তিনি কতো সহজ সরল ভাবে বিশেষ দরদের সঙ্গে বৈষ্ণব সাধনার নিগূঢ় সত্যকে রূপ দিয়েছেন। ভাবকে কতো সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ ক'রেছেন।

বৈষ্ণব-পদাবলী ও চৈতন্য-মঙ্গল:

মধ্যযুগের অন্ত্য-পর্বের বাংলা সাহিত্যের ভাষা ও ভাব কেমন ছিলো তার দু'টো উদাহরণ সাধারণ্যের জন্য তুলে ধরছি। কবি গোবিন্দ দাস ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে গৃহত্যাগী হন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। তখন থেকে তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গী রূপে তাঁর সঙ্গে নানা জায়গায় ভ্রমণ করেন। চৈতন্যদেবের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে তিনি অনেক কড়চা রচনা করেছেন। যেমন,–

১ : দাক্ষিণাত্যে চৈতন্যদেব লক্ষ্মী ও সত্যবালা নামে দুই গণিকার কবলে পড়লে, প্রভুর ভাবমুর্তি কিরূপ হ'য়েছিলো তা কবির লিখিত নিম্নোক্ত চরণগুলিতে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে :-

"কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে।
সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে।।
কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইলা স্তন।
সত্যরে করিলা প্রভু মাতৃ-সম্বোধন।।
থরথরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে।
ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে।।

কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে।
ধেয়ে গিয়ে সত্যবালা পড়ে চরণেতে।।

কবি গোবিন্দ দাসের বলিষ্ঠ বয়ান, রচণা-শৈলী ও ছন্দ-বিন্নাসে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, ঐ সময়েও ভাষার অমিয় লালিত্যে মানুষ মহিত হ'য়ে যেতো। প্রভুর মহিমা ও সংযমে গনিকারাও যে তাদের অন্তরের মনুষ্য স্বত্ত্বাকে জাগরিত ক'রে, অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত ক'রে প্রভুর চরণে পতিত হ'য়ে মনুষ্যত্বের যে নজির দেখিয়েছেন তা কবির লিখনিতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

২ : কবি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদে তদীয় পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের অবস্থা করুণ রসে অভিষিক্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল কাব্যে। যেমন:–

শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দেহ হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোকমুখে শুনি ইহা বিদারিয়া যায় হিয়া
আগুনেতে প্রবেশিব আমি।।
তোমার চরণ বিনি আর কিছু নাহি জানি
আমারে ফেলাহ কার ঠাঁই।
কি কইব মুঞি ছার আমি তোমার সংসার।
সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লইয়া মরি যাব বিষ খাইয়া
সুখে তুমি রহত এই ঘরে।।

৩ : স্বভাবতই জীবাত্মার প্রতীক শ্রীরাধা বলেন :–

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।।
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।।

ভগবানের কাছে তাঁর নিবেদন :–

মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসী।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিচয় হইলাম দাসী।।

৪ : বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস-এর কবিতায় যে ধ্বনি-মাধুর্য ও শব্দ-ঝংকার ঝংকৃত হয়ে মানব মনে প্রেমের বাঁশি বাজিয়েছে তা নন্দন-কাননের বিকশিত পুষ্পরাজির ন্যায় সৌরভ বিস্তার করে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে মর্তলোকে। যেমন:–

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব।।

অভিসারের একটি পদে দেখুন;–

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল

মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি তারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলী চাপি।।

৫ : বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসও শ্রীরাধার মরমিয়া প্রাণের আকুল আকূতি, বিরহ ব্যথার স্বকরুণ আর্তি, নীড় ভাঙ্গার আতঙ্ক, তাঁর কবিতার ছন্দে এমনভাবে বিচ্ছূরণ ঘটিয়েছেন যা প্রতিটা মানব-মানবীর বিরহ বেদনারই মূর্তপ্রকাশ:–

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।

নিবেদনের পদে দেখুন:–

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণে
সদা লইয়া রাখি বুকে।।

মানব জীবনে প্রেম-ভালোবাসার উদ্রেক হলেও ইহা অলৌকিক গুণে গুণান্বিত। বিধাতার সৃষ্টি মানব-মানবী প্রেম-ভালোবাসা নিয়েই মর্তে আগমন করেছেন। তাই ইউসুফ-জুলেখার যে প্রেম, শ্রীরাধা-কৃষ্ণেরও সেই একই প্রেম। লাইলী-মজনুর যে প্রেম, সাবিত্রী-সত্যবানের সেই একই প্রেম। রাজা গোপীচাঁদ-অদুনার যে প্রেম, শ্রীচৈতন্য দেব ও বিষ্ণুপ্রিয়ার পেমেও এতোটুকু পার্থক্য নেই। নন্দনকানন হতে এ প্রেম উৎসারিত হয়ে মানব-মানবীর মনে প্রবিষ্ট হয়। তাই প্রেম এতো মধুময়! প্রেম-বিরহে সবাইই সমানভাবে আহত হয়। প্রেম কোনো উচু-নীচু জানে না, ধর্ম-অধর্ম মানে না, প্রেমের কোনো জাত-কুল নেই, নেই কোনো বৈষম্য। তাই প্রেম সবার আরাধ্য হওয়া একান্তভাবে কাম্য।

অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য:

মধ্যযুগের আদি পর্ব হতে বর্তমান নব্যযুগ:

এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে পাঠক-সমাজের অবগতির জন্য অনুবাদমুলক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একটু দিক্‌পাত করতে চাই। কেননা বাংলা সাহিত্যে অনুবাদমুলক সাহিত্যভাণ্ডার বিশাল। তাই বিদগ্ধ পণ্ডিতদের গ্রন্থে প্রায়ঃসই দেখা যায়, তাঁরা এই সাহিত্যকে কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন তাঁদের (পাঠকদের) সুবিধার্থে। মধ্য-যুগের আদি থেকে অন্তঃ বা নব্য-যুগের আগ পর্যন্ত অনুবাদকগণ অনুবাদকমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং আধুনিক-যুগ বা বর্তমানকালেও অনুবাদকগণ অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেই যাচেছন। তাই এর ক্ষেত্র বিশাল ও ব্যাপ্রিত। আমার এই নাতিদীর্ঘ রচনায় এর বিষদ ও বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। সেজন্যই রচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে কিছু কিছু ছোঁয়াচ রেখে যেতে চাই।

অনুবাদকগণ প্রধাণতঃ দু'ধরণের অনুবাদ করে থাকেন। আক্ষরিক ও ঐচ্ছিক বা ভাবানুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদে অনুবাদকের মূল অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। কিন্তু ঐচ্ছিক বা ভাবানুবাদে লেখক বা কবির ইচ্ছামত রচনাশৈলীর বিচ্ছূরণ ঘটিয়ে তাঁদের রচনাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন। এতে কবি বা সাহিত্যিককে কোনো বাধাধরা নিয়মের মধ্য দিয়ে চলতে হয় না। তাই এ সব অনুবাদ হয় একেবারেই ভিন্ন ধরণের। এতে কবি-সাহিত্যিকগণ গ্রন্থের মূলসুর অক্ষুন্ন রেখে নিজের ইচ্ছানুসারে তাঁদের রচনায় শৈল্পিক জাল বুনন করে নিজের রচনাকে নান্দনিক করে তুলেন। কবি হোক আর সাহিত্যিক হোক তাঁরা তাঁদের রসভাণ্ডার উজোর করে দিয়ে তাঁদের রচনা গ্রন্থকে রসামৃত করে তুলে ধরেণ পাঠক সমাজের কাছে। তাই এসব রচনাকে অনুবাদকের নিজস্ব কির্তী বলে ধরে নেওয়া যায়। মধ্য-যুগীয় সিংহভাগ অনুবাদমূলক গ্রন্থই এ পথ বেয়ে চলে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ:–

রামায়ণ:

কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাংলার আপামর জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছে। তুর্কী আক্রমণের পর ক্ষত-বিক্ষত বাংলাদেশ ও বিশৃংখল বাঙালিদের শিল্প, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিধ্বস্ত হয়ে পরে। এই ক্ষত-বিধ্বস্ত বাঙালিদের সাংস্কৃতিক জীবণধারাকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অবদান অতুলনীয়। কৃত্তিবাস বাঙালি কবি ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট পণ্ডিত্য থাকা স্বত্ত্বেও বাল্মীকি রামায়ণ রচনায় তিনি সরল ও সহজ বাংলায় তাঁর গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন। কেননা তিনি জানতেন যে, তিনি এ গ্রন্থখানি আপামর বাঙালিজাতির জন্য রচনা করছেন। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান চির অক্ষয় হয়ে আছে। মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে কৃত্তিবাসের পর আরও ৫১ জন বাঙালি কবি বাল্মীকি রচয়িত রামায়ণ বাংলায় রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের কারো রচনাই কৃত্তিবাসকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি।

তিনি যে মনে-প্রাণে একজন কৌতুক প্রিয় বাঙালি ছিলেন নিম্নে প্রদত্ত তাঁর কাব্যের কয়েকটা চরণ যা বঙালির ভোজন বিলাসের ভোজ্যবস্তু ও ভোজনরীতি থেকেই পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যেমন:–

১ :

প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ।
তারপর সূপ আদি দিলেন সানন্দ।।
ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকারে কৈল বিতরণ।।
শেষে অম্বলান্তে হইল ব্যঞ্জন সমাপ্ত।
দধি পরে পরমান্ন পিষ্টকাদি যত।।

এবং -

ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স।
নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানারস।।
চর্ব চুষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি আস্বাদ।
যত পায় তত খায় নাই অবসাদ।।
কণ্ঠাবধি পেট হৈল বুক পাছে ফাটে।
আচমন করি ঠাট কষ্টে উঠে খাটে।।

অন্যত্র দেখুন, কেমন ভাবগম্ভীর ও করুণরসে ভরপুর কাব্যাশে তিনি নির্মল কৌতুকরস সৃষ্টি করে বৈচিত্র আনায়নের প্রযাস পেয়েছেন। যেমন:–

২ :

কুপিত হইল বীর পবন নন্দন।
বাড়াইয়া দিল লেজ পঞ্চাশ যোজন।।
লেজ দেখি রাবণের বড় হৈল ডর।
ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর।।
ত্রিশ মণ বস্ত্র সবে আনিল নিকটে।
এত বস্ত্র আনে এক বেড়ে নাহি আঁটে।।
লঙ্কার মধ্যেতে ছিল যতেক কাপড়।
ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড়।।
হয়েছিল যে দুঃখ বালির লেজ টেনে।
লেজ দেখি রাবণের তাহা পড়ে মনে।।
তিন লক্ষ রাক্ষস চাপিয়া লেজ ধরে।
সবে মিলি লেজ ফেলে ভূমির উপরে।।
কাপড় তিতিল লেজ পড়িল ভূতলে।
লেজে অগ্নি দিতে সব দাউ দাউ জ্বলে।।
লেজে অগ্নি দিতে দেখি হনুমান হাসে।
আপন বুদ্ধিতে বেটা পড়ে সর্বনাশে।

এরপর যা ঘটে তা সর্বজন বিদিত:–

ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনুমান।।
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে।
কে করে নির্বান তারে কেবা কারে বলে।।
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় ঘরের চাল।
অর্ধেক স্ত্রী পুরুষের গায়ের গেল ছাল।।
উলঙ্গ উন্মত্ত কেহ পলায় উভ রড়ে।
লেজে জড়াইয়া ফেলে অগ্নির উপরে।।

ভাগবতঃ

মালাধর বসু কবি কৃত্তিবাসের মতো একজন গুণধর ও শক্তিশালী কবি ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনা করে রাজ সম্মান লাভ করেন। কবির উক্তিতেই কাব্যের রচনা কাল ও রাজ সম্মান প্রাপ্তি প্রমানিত হয়েছে। যেমনঃ–

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হইল সমাপন।।
গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।।

এই হিসেবে গ্রন্থের রচনা কাল হয় ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেক পড়ে কবি মালাধর বসু কর্তিক ভাগবতের দশম স্কন্ধ অনুদিত হয় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে। ইহা বাংলা সাহিত্য ছাড়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যে বাল্য ও কৈশর লীলা বিধৃত হয়েছে তাতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মালাধর বসুর কাব্য ভাগবতের দশম স্কন্ধের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। কবি কৃত্তিবাসের ন্যায় মালাধর বসুও তাঁর কাব্যের মূল বিষয় আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ও পরিবেশের উপর দাঁড়ো করিয়েছেন। যেমনঃ–

রজনী প্রভাত হইল রাম দামোদরে।
বাছুর রাখিতে গেলা যমুনার তীরে।।
ভোজন করিয়া সবে সিঙ্গা বাজাইয়া।
পশ্চাতে চলিলা শিশু বাছুর লইয়া।।
একত্র হইয়া সবে যমুনার তীরে।
নানাবিধ ক্রীড়া করি যায় ধীরে ধীরে।।
কতিহঁ কোকিল পক্ষ সুস্বর নাদ পুরে।
তার সঙ্গে রা কাড়ে রাম দামোদরে।।
কতিহঁ মর্কট শিশু লাফ দেই রঙ্গে।
তেন মতে যায় কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে।।
কতিহঁ মউর পক্ষ নানা নৃত্য করে।।
তাহা দেখি তেমত নাচে রাম দামোদরে।।
কতিহঁ পক্ষগণ আকাশে উড়ি যায়।
তাহার ছায়ার সঙ্গে ধাইয়া বেড়ায়।।
কোথাহ বুলেন ফুল তুলিয়া মুরারি।
কথো কানে কথো হৃদে নানা বর্ণে পরি।।
তেন মতে বৃন্দাবনে গেলেন গোপাল।
বড় ক্ষুধা হৈল সব বসএ ছওয়াল।।

কবি মালাধর বসু সুচিন্তিত ও সুনিপুনভাবে তাঁর সৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণবিজয় অর্থাৎ ভাগবতকে নতুন রং-এ রঞ্জিত করার জন্য ভাগবত বহির্ভূত অনেক আখ্যান-উপাখ্যানের সংযোজন ঘটিয়েছেন। যেমন– "কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদ, জরাসন্দের জন্ম বিবরণ, শিশুপাল-বধ, শিশুপালের জন্মবিবরণ, বজ্রনাভ-দৈত্য বধ" ইত্যাদি আরও অনেক। যারদরুন এ কাব্যখানি বাংলার জনগণের মনোমুগ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। কাব্যখানির ভাষাসৌকর্য, শব্দবিন্যাস, ছন্দোনৈপুন্য, নন্দনতত্ত্ব ও

আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সমন্বয় কবির পারদর্শীতার পরিচয় বহন করে। মালাধর বসুর পর আরও ১৫/১৬ জন কবি ভাগবত রচনা করেছেন কিন্তু কেহই মালাধর বসুকে অতিক্রম করতে সমর্থ হন নি। তবে কবি দৈবকীনন্দন সিংহ তাঁর কবিত্ব রচনায় যথেষ্ট পারদর্শীতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেছেন। যেমন–

শিখণ্ডমণ্ডল উড়ে চূড়ার উপরে।
ইন্দ্রধনু উঠে যেন নবজলধরে।।
ললাটে চন্দনরেখা অতি সে উজলী।
নবজলধরে যেন ধবল বিজুলী।।
অঞ্জনে রঞ্জিত আঁখি দেখি মনোহরে।
মধুলোভে কমল বেড়িল মধুকরে।।

মহাভারতঃ

মহাভারত সম্বন্ধে কোনো কিছু লেখার পূর্বে ভারত কীভাবে মহাভারত হলো সে বিষয়ে পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। পুরাকালে নন্দনকাননে দেবতাদের এতো সংখ্যাধিক্য ঘটে ছিল যে, তাঁদের পদভারে স্বর্গোদ্যান হয়েছিলো টলটলায়মান। তাঁদের মধ্যে তখন দলাদলি এবং পরস্পরের প্রতি বিরোধভাব প্রকট হয়ে উঠেছিলো। দেবতাদের মধ্যে বেদচতুষ্টয় ও ভারতের প্রাধান্য নিয়ে ভীষণ দলাদলি ও গণ্ডগোল চলছিলো এমন সময় মহাদেবের নির্দেশে গাণিতিক নীলকণ্ঠ, দেবতাদের সংখ্যা সংক্ষেপনের জন্য তৎপর হলেন। মহাভারতের ১২শঃ শ্লোকে ইহা বিধৃত আছে। যেমনঃ–

ত্রয়স্ত্রিংশতসহস্রানি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ।
ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ দেবানাং সৃষ্টিঃ সংক্ষেপলক্ষণা।।

অর্থাৎঃ–

শতসহস্রাদি সংখ্যা পরস্পর বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে। এই পরস্পরবিরুদ্ধ ত্রিবিধ সংখ্যার টীকাকার নীলকণ্ঠ এই সমন্বয় করিয়াছেন যে, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা। ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত অথবা ত্রয়ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যা তাহাদিগের পরিবারাদিসহ গণনাভিপ্রায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই বাহুল্য সংখ্যাও সংক্ষেপ সৃষ্টি অভিপ্রায়ে উল্লিখিত। বিস্তারিত সৃষ্টি অভিপ্রায়ে পুরানান্তরে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি সংখ্যার উল্লেখ আছে। অর্জুন মিশ্র প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়া পরিশেষে যথাশ্রুত গ্রন্থার্থ সামঞ্জস্য সংস্থাপনে ব্যগ্র হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ এই তিনের সমষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ ৩৩৩৩৩৩ দেবতাদিগের সংক্ষেপ সৃষ্টি। তখন সকল দেবতাগণ একত্র হইয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে চারি বেদ ও অপর দিকে এই ভারত স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারত সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা ভারে অধিক হয়, এজন্য তাবধি ইহলোকে ভারত মহাভারত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পরিমানকালে এর মহত্ব ও ভারবত্ব উভয়ই অধিক হলো, সেই নিমিত্ত এর নাম মহাভারত। ইহাই মহাভারত শব্দের বুৎপত্তি।

বাংলা মহাভারতের আদি রচয়িতা কবি সঞ্জয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর। কবীন্দ্রের মহাভারত রচিত হয় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সীমান্তবর্তী ফেনী-নদীর উপকূলে। এই সময় আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯৩ – ১৫১৯ খ্রিঃ) ছিলেন গৌড়ের সম্রাট। বাংলা সাহিত্যের জগতে সম্রাট হুসেন শাহর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বাংলার সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির অভুতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছিলেন। তাঁর দ্বারাই বিধ্বস্ত বাঙালির দ্বিতীয় বিজয় সাধিত হয়েছিলো।

দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এবং জৈমিনি মহাভারতই বাংলার সর্বত্র প্রচার লাভ করেছিলো। বাংলায় মহাভারতের অনুবাদ প্রধানতঃ জৈমিনি মহাভারতের অনুসরণেই হয়েছিলো। মহাভারতের চরিত্রগুলো কবিদের প্রচেষ্টায় নির্দিষ্ট সীমার বাইরে থেকে স্বতস্ফূর্ত বিকাশ লাভ করে জনগণের মন আকর্ষন করতে পেরেছে, তার ফলে তাঁদের আবেদন জনমনস্পর্শী হয়েছে। অবশ্য অন্যান্য মহাভারতের তুলনায় কাশীদাসী মহাভারতই জনচিত্তে অধিক আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তার কারণ কাশীদাসের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যে মহাভারতের চরিত্রগুলো বাঙালি মানসের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছে। তাই কাশীদাসের ভারত-কাহিনীর রসপানে যুগ যুগ ধরে বাংলার মানুষ পরিতৃপ্ত।

কাশীরামদাসের কাব্য রচনায় কোথাও কোথাও সংস্কৃতের ছোঁয়াচ পরিদৃষ্ট হয। তাতে তাঁর বাংলা অনুবাদ কোথাও দুর্বোধ্য হয়নি। কেননা তিনি জানতেন যে, তার বঙ্গানুবাদ গ্রন্থখানি কেবল বাঙালিদের উদ্যেশ্যেই লেখা। যারদরুণ বাংলার এই মরমিয়া কবি তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে বাঙালির জন্য রেখে গেছেন কালজয়ী এ গ্রন্থ "মহাভারত।"

কাশীরামদাসের আগে আরও ৬ জন বাঙালি কবি এবং তাঁর পরবর্তি সময়ে ৫১ জন বাঙালি কবি বাংলায় মহাভারত রচনা করেছেন। কিন্তু কেহই কবি কাশীরামদাসকে অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হন নি। এজন্যই কবি শুধু বাঙালি হিন্দুদেরই মন জয় করেন নি তিনি সমভাবে মুসলমানদেরও অন্তর জয় করতে সক্ষম হযেছেন। সক্ষম হয়েছেন পরিপূর্ণ করতে বাংলার সহিত্য-ভাণ্ডার। যেমন:–

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি।।
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখ রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।।
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত কবিবর।।
ভুজ যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুবলিত।।
মহাবীর্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু জালে আচ্ছাদিত।।

অর্জুন লক্ষ্যভেদ করলে:–

বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি।।
হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা।।

কাশীরামদাসের কাব্যে রয়েছে ছন্দঃপ্রকরণ, শব্দবিন্যাস, নান্দনীক অলঙ্করণ, রয়েছে করুণ ও রৌদ্র রসের সমাহার, বীর-ভয়ঙ্কর-বীভৎস ও অদ্ভুত রসের সংমিশ্রণ। যা বাঙালি মনে দোলা দিয়ে তাদের বিহ্বল করে তুলেছে। কবির আদর্শ, নীতিবোধ, ন্যায়-নিষ্ঠা ও মমত্ববোধে আকৃষ্ট হয়ে বাঙালি কবিকে তাদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান

সময়ের স্রোতধারায় এই বাংলার বুকে বাঙালি ও বাংলাভাষার উপর বহুজাতি বহুভাবে হেনেছে খর্গকৃপান। যারদরুণ বাংলা ভাষা তার আপন গতিতে অগ্রসর হতে পারে নি, হয়েছে বিঘ্নিত ও বাধাপ্রাপ্ত বারবার। যেমন পাল রাজত্বের সময় বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় আবার হাপসী সুলতানদের আক্রমণে তা সম্পূর্ণভাবে লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যায়। পুনরায় সম্রাট হোসেন শাহ-এর সময় বাংলা ভাষা পুনরুজ্জীবিত হয়ে প্রসার লাভ করে। অথচ মোঘল আমলে তা ব্যাহত হয়। ইংরেজ আমলে ভাষার ওপর স্বাধীণতা থাকার দরুণ ইহার উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু পাকিস্তান আমলে তা খর্বিত হয়ে পরে যথেষ্টভাবে। তাঁরা বাংলা ভাষার ওপর নানারূপ বাঁধানিষেধ আরোপ করে বাংলা ভাষার প্রভুত ক্ষতি সাধন করে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে শুরু হয়েছিলো ভাষা আন্দোলন।

হাঁ-নির্দিধায় বলা যায় বাংলা ভাষার উন্নতি কল্পে মুসলমান সম্রাট ও তাঁদের আমলাদের অকার্পন্য সহযোগীতা ও পৃষ্টপোষকতা রয়েছে এবং রয়েছে তাঁদের বদান্যতা ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা। মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের অভুতপূর্ব জাগরণই তার সাক্ষী। এ সময়ে বাংলার বুকে চলে আসছিলো নানারূপ বিশৃঙ্ক্ষলা, বিবাদ-বিতণ্ডা, ধর্ম এবং সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে চলছিলো দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার রেশারেশি, মারা-মারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা। কিন্তু তৎকালীন সম্রাটগণ তা কঠোর হস্তে দমন করে বাংলার বুকে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে তাঁরা মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের মতো হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদেরও সমানভাবে সহযোগীতা ও সম্মান প্রদান করে থাকেন। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান বা জাতিগত কোনো ভেদাভেদ স্থান পেতো না। তিনি সে সময়কার হিন্দু গুণী কবি-সাহিত্যিকদের নানারূপ রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত করে তাঁদের উৎসাহিত করতেন। তাই বাংলা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে সম্রাট হোসেন শাহ-এর নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী এবং বাংলা ভাষার উন্নতি কল্পে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠাও আমরা যেন ভুলে না যাই।

মধ্যযুগীয় মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম ও কাব্য রচনার কৌশল, সুনিপুন শব্দ চয়ন, ছন্দো-বিন্যাশ এবং আধ্যত্মিক ও জাগতীক চিন্তাধারা কিভাবে তাঁদের সাহিত্য ও কাব্যে প্রতিফলন ঘটিয়েছে তা সুবিজ্ঞ পাঠক সমাজের দুষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে বলে মনে করি। নিম্নে তার কয়েকটা উদাহরণ তুলে দেওয়া হলো। যেমন–

১ : কবি আলাওলঃ

একভাগ শৈশবতা যায় খেলারসে।
আর ভাগ যৌবনতা মত্ত কামবশে।।
শেষকালে জরা ব্যাধি ধরিব আসিয়া।
কোনকালে পুণ্য হৈব বুঝহ ভাবিয়া।
ক্ষেণে শিরপীড়া ক্ষেণে জরাজন্ম বায়ু।
যার অঙ্গে রোগ হয় তিক্ত লাগে আয়ু।।

কবি আলাওলের কাব্যে যে, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে তা আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়ে জীবন সম্বন্ধে কতোটুকু সফলতা আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন তা আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি।

২ : কবি শেখ সাদীর রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো:–

তবে মালিকাএ পুছে ফকিরের আলয়।
এক বৃক্ষে বার ডাল আছিল নিশ্চয়।।
এক এক ডালে ধরে ত্রিশ ত্রিশ পাত।
বেশ কম নাহি তাথে সম সরতাজ।।
সে পত্রের এক পৃষ্ঠে সফেদ আকার।
আর পৃষ্ঠে সেহা রঙ্গ শুন কহি সার।।
এক এক পত্রে ধরে পঞ্চ পঞ্চ ফুল।
আল্লাহর কুদরতের ফুল দিতে নাহি তুল।।

এ কবিতায় রোমাণ্টিক বা প্রণয়োপাখ্যানের রস সঞ্চার নেই। যারদরুণ সাদীর এ কবিতা সাধারণ জনমনে রস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু এর মধ্যে যে, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তথ্যের বিশ্লেষণ রয়েছে তা সবকিছু ছাড়িয়ে-ছাপিয়ে, গিরি-শিখড়ের উচ্চ স্থানে স্থান করে নিয়েছে তা অনস্বীকার্য।

৩ : কবি দৌলত কাজী:

অঙ্গুল-ইঙ্গিত-শরে শশী দুই খণ্ড করে
প্রলয়-সমান তান দাপ।।
মুসলমানী মূল বাতি যার তেজে জ্বলে নিতি
না নিবায়ে বায়ূ-বৃষ্টি-জলে।।

কবি তাঁর 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' উপাখ্যানের ভূমিকাতে নবী রসূলের যে, শক্তি ও মহিমার সন্ধান দিয়েছেন তা অতুলনীয়। তিনি মহান আল্লাহতালার শক্তির বিকাশ তাঁর (আল্লাহর) প্রিয় নবী রসূলের মধ্যদিয়ে জনমানসে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন বললে এতোটুকু অত্যুক্তি হবে না বলে মনে করি।

মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি।
রাজভয়ে মাতঙ্গে না যায় তারে ঠেলি।।
বিধবা নির্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্নভার।
ভীমসম বলীও না করে বলাৎবার।।
সীতা সম সুন্দরী যদি রহে সে বনে।
রাজ-ভয়ে না নিরক্ষে সহস্রলোচনে।।

রোসাঙ্গরাজের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি এবং তাঁর কঠোর ও সুশাসনে প্রজাকুল কেমন ভীত ছিলেন কবি দৌলত কাজী তাঁর কাব্যে তা সুন্দরভাবে প্রস্ফূটিত করে তুলেছেন।

চন্দ্রানী তোমার মিলন মনোরম।
বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম।।

কবির অতুলনীয় ভাবনা, হৃদয়স্পর্শী বয়ান, ছন্দো ও রসের মিলন জনসাধারণের মনকে ছুঁয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, কেননা এ উপাখ্যান তৎকালীন সময়ে জনগণের মুখে মুখে বিস্‌সা-কাহিনীর মতো সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিলো। এ উপাখ্যানে তিনি সুন্দর ও পাণ্ডিত্যের বিচ্ছূরণ সমভাবে ঘটিয়ে জনগণের মন জয় করেছিলেন। এসব কারণেই 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' উপাখ্যানটি এতো জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

নাথ সাহিত্য:

নাথ-সাহিত্যে আমরা দু'টো ধারা পর্যবেক্ষণ করে থাকি।

১: মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয়:
২: ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গান:

উভয় ধারার সাহিত্যেই আমরা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের উপস্থিতি লক্ষ্য করে থাকি। যেমন:– মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ, জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপা, গোরক্ষনাথ বা গেরখনাথ (গোর্খনাথ), কানুপা বা কাহ্নপাদ। এই সিদ্ধাচার্যদের নামের সাথেও নাথ-সাহিত্যের মিল রয়েছে। নাথ উপাধি হতে নাথ-সাহিত্যের সৃষ্টি বললে হয়তো ভুল হবে না। তবু বাংলা সাহিত্যের যাঁরা কর্নধার সেসব পণ্ডিতদের গভেষণা ও বিধান আমাদের মেনে চলতেই হবে। আমরা শুধু নিজের মতটুকু প্রকাশ করতে পারি। এই সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাব কোথায়, কোন সময়, কিভাবে হয়েছিলো তা নিয়েও বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ একমত নন। এঁদের মধ্যেও মতানৈক্য রয়েছে প্রচুর। তবুও নাথ-সাহিত্যের সৃষ্টি যেভাবেই হোক না কেন এই সাহিত্য ও গানগুলি বাংলার বুকে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এমন কি বাংলার মুসলমানগণও নাথ-সাহিত্য ও গানের ভক্ত ছিলেন এবং এখনও বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে এর যথেষ্ট প্রচলন ও জনপ্রিয়তা রয়েছে।

নাথ-সাহিত্যের দু'টো ধারার দু'টো উপাখ্যানই পুরাকালে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে গীত হতো এবং এভাবেই লোকের মুখ থেকে মুখে, সমাজ থেকে সমাজে, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে দেশব্যাপী জনগণের মনের গহীণে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে বললে এতোটুকু অত্যুক্তি হবে না। এ দু'টি কাহিনীর ভাবধারা সম্পূর্ণ পৃথক। একটার সাথে অন্যটার কোনো মিল নেই অথচ দু'টো কাহিনীই এমনভাবে রচিত হয়েছে যে, মানুষের কাছে ইহা সমানভাবে আদৃত হয়েছে। এ নাতিদীর্ঘ রচনায় কাহিনী দু'টো অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব নয়। শুধু কাহিনীদ্বয়ের মূল উৎস্য ও নামের সার্থকতাটুকু তুলে ধরা হলো।

ক : দেবতা শিবের অভিশাপ প্রাপ্ত গুরু মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ কদলী ললনাদের মহিনীমায়ায় মোহগ্রস্ত হয়ে নিজের সাধনার বিষয়ে বিস্মৃত হন এবং কামিনী মোহগ্রস্ত হয়ে জাগতিক ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে উঠেন। তদীয় শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁর মোহগ্রস্ত গুরুকে ভ্রষ্টপথ হতে উদ্ধার করেন। গুরু ও শিষ্যের এই ঘটনাবলীকে অবলম্বন করেই এ কাহিনী বা উপাখ্যানের সৃষ্টি। গুরু ও শিষ্যের কথোপকথন, বাগবিতণ্ডা কোনো কোনো সময় এমন পর্যায়ে চলে যেতো যে, কবিগণ তার স্ফূরণ ঘটাতে বাধ্য হয়ে গূঢ়রহস্যপূর্ণ, দুর্বোধ্য পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহারে বাধ্য হয়েছেন। তারই দু'টো নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো। যেমন–

পোখরীতে পানী নাই পাড় কেন বুড়ে (ডুবে)।
বাসাঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে।।
নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চাল।
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল।।
ঝিম যাউক বরিষা শীতলে যাউক মীন।
ঝাঁপিয়া তরীতে পাড়ি সমুদ্র গহীন।।

এবং অন্যত্র দেখুন–

মহাতেজে কুড়ালেতে সমর্পিলা গুরু।
ব্যাঘ্রের সম্মুখে তুমি সমর্পিলা গরু।।

ময়নামতী হলেন বাংলার রাজা মানিকচন্দ্রের পাঁচ রাণীর এক রাণী ও সিদ্ধাচর্য গোরক্ষনাথের একজন শিষ্যা এবং রাজা গোপীচন্দ্রের জননী। দেবতা শিব হলেন কৃষককুলের দেবতা। রাজা মানিকচন্দ্রের মন্ত্রীগণ কৃষকদের ওপর অত্যাচার-

অনাচার, উৎপীড়ণ-নিঃপীড়ণ শুরু করলে শিবের অভিশাপ প্রাপ্ত হয়ে রাজা মানিকচন্দ্র মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু শিবের বরে ময়নামতী পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং তাঁর নাম রাখেন গোপীচন্দ্র। শিব ময়নাকে এও বলেন যে, তোমার পুত্রের আয়ূষ্কাল মাত্র উনিশ বছর। কিন্তু সে যাদি বার বছর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে এবং হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তবে সে মৃত্যু ফাঁড়া হতে রক্ষা পাবে। সেজন্যই মায়ের আদেশ ও উপদেশে রাজা গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পূর্বে মাকে বলেন–

পাইসালে খাটে হাড়ি না করে সিনান।
তার ঠাঞি কেমনে আছয়ে ব্রহ্মজ্ঞান।।
আমি রাজা গোবিন্দাই সর্বলোকে জানে।
কেমনে ধরিতে বল হাড়ির চরণে।।

এরপর মায়ের অলৌকিকরূপ দেখে রাজা গোপীচন্দ্র তাঁর জাগতিক জ্ঞান হাড়িয়ে ফেলেন এবং সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন ও অদুনার কান্না তুচ্ছ করে বলেন–

সংসার জলের বিম্ব সব মিছা কায়া।
এ তিন ভুবনে দেখ আপনার কায়া।।
ইষ্ট মিত্র বন্ধুবান্ধব মিছা কায়।
কাষ্ঠের পুতুল যেন বাদিয়া নাচায়।।

রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-যাত্রার প্রাক্কালে রাণী অদুনার কাতর আর্তিতে এটুকু অনুমিত যে, কবি তাঁর কবিতায় মানবীয় রূপটির যথেষ্ট প্রস্ফূটণ ঘটিয়েছেন। যেমন:–

না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কার লাগিয়া বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর।।
বান্ধিলাম বাঙ্গালা ঘর নাই পরে কালি।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালী।।
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন।।
দশ গিরির মাও বইন রবে স্যামী লইবে কোলো।
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে।।
আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও।
জীয়ন জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।।
রাঁধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে।
পিপাসার কালে দিমু পানি।।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী।।

অন্যত্র বিরহিণী নারীহৃদয়ের আর্তি ও আকাঙ্কার প্রকাশে যে মানবীয় রস উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে:-

কতকাল রাখিব যৌবন আঞ্চলে বান্ধিয়া।
বাহির হৈল যৌবন হৃদয় ফাটিয়া।।
নেতে বান্ধিলে যৌবন নেতে হৈব ক্ষয়।
প্রথম যৌবন গেলে কেহ কারো নয়।।
নেতে বান্ধিলে যৌবন চটগিয়া উঠে।
স্বামীকে পাইলে যৌবন কভু নাহি টুটে।।

বিরহিণী নারীর হৃদয়ের এই অপরিসীম জ্বালার আবেগঘন প্রকাশের মাধ্যমেই বোধ হয় যৌবনের অতলস্পর্শ নিগূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটন সম্ভব হতে পারে।

মঙ্গলকাব্য:

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্যের সময় সীমা হলো খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দী। এই সময় সীমার মধ্যে ধর্ম এবং দেব-দেবীদের নিয়ে মানুষের কল্যাণার্থে যেসব কাব্য-কবিতা, আখ্যান-উপাখ্যান, কিস্‌সা-কাহিনী রচিত হয়েছে, সেসবই মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিতি লাভ করেছে। বাংলায় মঙ্গল শব্দের সাধারণ অর্থ হলো কল্যাণ। পক্ষান্তরে কবিতার ভাষায় শব্দটিকে কোনো মহৎ ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের গুণকীর্তন হিসেবেও দোহাকারগণ, কবিগণ প্রয়োগ করে থাকেন। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাই যে, মঙ্গলকাব্যের কবিগণ ঐহিক আপদে-বিপদে, উৎপীড়ণ-নিঃপীড়ণে, ভয়-ভীতিতে এবং আধি-ব্যাধিতে, মানব-কল্যাণ-সধনে যেকোনো দেব-দেবীর গুণকীর্তন করে তাঁদেরকে মর্তভূমে আনয়ন করেছেন।

উপরে যে, সময়কাল সূচিত হয়েছে সে সময়টা ছিলো বাংলাদেশ ও বাঙালি হিন্দুদের এবং আর্য ব্রাহ্মণদের জন্য একটা চরম মুহূর্ত বা দুঃসময়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় দিক দিয়ে চলছিলো বেশ ঘোলাটে পরিস্থিতি। বৌদ্ধদের আক্রমণ, এদিকে ইসলাম ধর্মের শান্তি ও মহাত্ম প্রচারের তৎপরতা, মুসলিম শাসকদের তৎপরতা ইত্যাদি মিলে হিন্দু জনজীবন ও ব্রাহ্মণদের জীবন হয়ে উঠেছিলো দুর্বিসহ। এসব ঘোলাজলের মধ্য থেকে শীতলজল পান করে নিজেদের আত্মরক্ষার্থে তাঁরা বেছে নিলেন ভিন্নপথ। তারা স্বর্গের দেব-দেবীদের মর্তে আনয়ন করে, তাঁদের পূজার্চনা ও গুণকীর্তন করে মর্তভূমে প্রতিষ্ঠিত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। অথচ এ বিষয়গুলি ছিলো গৌন। মুখ্য বিষয় ছিলো আধি-ব্যাধির ভয়। এ ভয়ে হিন্দু, মুসলমান এবং বৌদ্ধ সবাই ছিলো সমানভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত। কেননা বাংলাদেশে তখন কলেরা, শীতলা মহামারী আকার ধারণ করতো এবং হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হতো। গ্রামকে গ্রাম তখন জনশূণ্য হয়ে পরতো। উপরন্তু ছিলো হিংস্র প্রাণীদের আক্রমণ এবং অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির নিষ্ঠুর আধাতে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। এতেও হাজার হাজার লোক মুত্যুবরণ করতো। তখনি শুরু হয় 'ওলাবিবি', 'শীতলাদেবী', 'মনসাদেবী', চণ্ডীদেবী ও 'শিবঠাকুর'-এর পূজার্চণা। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রত্যান্ত অঞ্চগুলির জনসমাজের বুক থেকে সৃষ্টি হয়েছে লোকসাহিত্য, লোকগীতি ইত্যাদি। এসব প্রত্যান্ত অঞ্চলের জনসাধারণ ছিলো অত্যান্ত সহজ-সরল। তারা ছিলো ধর্মভীরু। তাই তারা মনে করতো যে, মনসার পূজা দিয়ে দেবীকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে সাপের হাত হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। ওলাবিবি ও শীতলাদেবীর পূজা দিয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট রাখতে পারলে কলেরা এবং বসন্ত রোগ হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। শক্তির প্রতীক চণ্ডীদেবী অর্থাৎ মা-কালীকে সন্তুষ্ট রাখলে অন্যদের হাত হতে রক্ষা পওয়া যাবে। শস্য উৎপাদক ও ভাঙ্গাগড়ার দেবতা শিবকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে ভাঙ্গগড়া ও দুর্ভিক্ষের হাত হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। এভাবেই ইহলোকে স্বর্গদেবতাদের আনয়ন করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তারই দু'একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো। যেমন:–

১ : সর্পাঘাতপ্রাপ্ত লখিনদর বেহুলার উদ্দেশ্যে বিলাপ করছে:–

ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কাল নাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও।।
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতিতলে।
অকারণে রাঁড়ী হইলা খণ্ডব্রত ফলে।।
কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর।
সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লক্ষীন্দর।।
মাও সোনকা মোর মৃত্যুকথা শুনি।
অগ্নিকুণ্ড করি মায়ে ত্যজিবে পরানি।।
আমার মরণে মায়ে বড় পাবে তাপ।
পুত্রশোকে মাও মোর সাগরে দিবে ঝাঁপ।।
আমার মরণে মাও হইবে পাগল।
মাগনি হইয়া মায়ে বেড়াবে শহর।।
ছয়পুত্র পাসরিল আমাকে দেখিয়া।
কেমনে ধরাবে দুঃখ মা ঘরে রইয়া।।
খেয়াতি রাখিল মায়ে সংসার জুড়িয়া।
মায় পুত্রে মরিবেক চিতাতে পুড়িয়া।।
চিতা সাজাইবে নিয়া গুঙরীর তীরে।
আমা সঙ্গে পশিবে অগ্নির মাঝারে।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।

পয়ার ছাড়িয়া এক বলিব নাচাড়ী।।

২ : লখিন্দরের মৃত্যুতে সতীলক্ষ্মী বেহুলার স্বামী শোকে কাতর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের রোদন কবি কালিদাসের বর্ণনায় সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। যেমন:–

কান্দে বালিয়া করিয়া বিলাপ।
ললাটে হানিয়া কর অঙ্গ এড়ি অনাদর
উপজিল বিষম সন্তাপ।।
পড়িয়া ভূমির তলে ভাসিল নয়ান জলে
ধৌত হইল উজ্জ্বল কাজল।।
পড়িছে আনন মাঝে জেন দেখি দ্বিজ রাজে
শোভিত করয়ে কলেবর।।

শাক্ত পদাবলী:

পুরাকালে বাংলার বুকে যে 'শক্তির' পূজা-অর্চণা প্রচলিত ছিলো তা আমরা শাক্তপদাবলী বা শক্তি সাধন তত্ত্বে অনুমান করেতে পারি। সে সময়ে বাংলার মানুষ প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, সহমর্মীতা ও সহযোগীতার চেয়ে শক্তি সাধনা এবং জিঘাংসার নিদারুণ প্রবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করতেন। এরই পূর্বে বৈষ্ণব সাধন তত্ত্বে আমরা পর্যবেক্ষন করে থাকি যে, তাঁরা সংসার বিরাগী জীবন যাত্রাকে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য প্রাধান্য দিয়েছেন বেশী। কিন্তু শক্তি সাধনায় এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকটাই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। শক্তি সাধকদের মূল মন্ত্রই হলো সংসার-জীবন এবং বৈষয়িক ভোগ-বিলাসিতা। এর তারণা শুধু বাইরের দিক থেকেই আসেনি এর প্রবনতা এসেছে অন্তরের গভীর দিক থেকে। যারদরুন এই চিন্তাধারাকে আমরা কোনোভাবেই উপেক্ষা করতে পারি না। ইতোপূর্বে বৈষ্ণব সাধন তত্ত্বে এবং সমাজের বুকে যে, পরকীয়া ও অবৈধ প্রেমের প্রসার ঘটেছিলো যা ক্রমান্বয়ে সমাজের বুক থেকে মুছে গিয়ে শক্তির উৎস মা-চণ্ডীদেবী বা মা-কালীর মমতা ও স্নেহের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। কেননা এ সময়ে বাংলার বুকে চলছিলো নানারূপ নির্যাতন, নিঃষ্পেষণ ও অরাজকাতা। তাঁদের অন্তরে এমন বিশ্বাসের উদয় হয়েছিলো যে, একমাত্র মাই পারেন তাদের এই সব অরাজকতা হতে সুন্দর জীবনের সন্ধান দিতে। তাই শক্তির সাধক কবি রামপ্রসাদ-এর সৃষ্ট শাক্ত পদাবলী ও গান সাধারণ জনগণের সাধন-ভজন-এর উৎস হয়ে এতো জনপ্রিয়তা লাভ করলো যে, বাংলার ঘরে-ঘরে, মুখে-মুখে ঝংকৃত হয়ে মা ও সন্তানের স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসার বানে ভেসে গেলো সকল কলুষতা ও মলিনতা। যার জোয়ার এখনো বাংলার মানুষের মনে দোলা দিয়ে যায়। সাধকগণ তাঁদের সাধনায়, ধ্যান-ধারণায় মায়ের যে, বিমূর্তরূপ দেখতে পান তা সত্যি ভয়ঙ্করী ও ভয়াবহ। তিনি হলেন শ্মশাণ-চারিণী, নরমুণ্ড-ধারিণী, তাঁর এক হাতে খর্গ অন্য হাতে নরমূণ্ড, এই রক্তপিপাষু ভয়ঙ্করী ও অভয়দায়িণী রূপই মার শত্রু সংহারের উপযুক্ত রূপ বা কায়া।

১ : শাক্তগীতিকাব্য হিসাবে রাম প্রসাদের "কালীকীর্ত্তন" বিশেষ উৎকর্ষের দাবি রাখে। বাংলার গৃহাঙ্গনে জননী এবং কন্যার স্নেহনিবিড় সম্পর্ককে তিনি অতি চমৎকারভাবে ধরে রেখেছেন তাঁর নিম্নোক্ত পদটিতে:–

গিরিবর আর আমি পারি নাহে প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেদে করে অভিমান নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শাক্তপদাবলী রচনার সময়ে রাজনৈতিক পরিবেশ ছিলো খুবই ঘোলাটে। শাসকদের অত্যাচারে জনজীবন হয়ে উঠেছিলো দুর্বিসহ। যারদরুণ শাক্ত কবিগণ শক্তির পূজারীরূপে মা কালীর সাধন-ভজন শুরু করেন। রামপ্রসাদের গানে কালীর ভীষণ-মূর্তির কাছে উমার বাৎসল্যরসের কল্পনা বাঙালির মনে জননীর কঠোর ও কোমল রূপটি প্রকট হয়ে উঠে।

২ : সংসারের প্রতিকুল অবস্থা, রাষ্ট্রিয় গোলোযোগ অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে কবি রামপ্রসাদ মায়ের উপর অভিমান করে তাঁর কাব্যে গেয়ে উঠেন। যেমন:–

মা মা বলে আর ডাকব না।
মা দিয়েছ, দিতেছ কতই যাতনা।।

আমি ছিলাম গৃহবাসী, বানালি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।।
না হয় দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ম'লে কি তার ছেলে বাঁচে না।।
রামপ্রসাদ ছিল গো মায়েরই পুত্র।
মা হয়ে হলি গো ছেলেরই শত্রু।।
মা বর্তমানে এ দুঃখ সন্তানে,
মা থেকে তার কি ফল বল না।।

৩ : মায়ের প্রতি অভিমানবশতঃ কবি দশরথি রাম শ্যামা মাকে তাঁর দুঃখের অহঙ্কার-বার্তা শুনিয়ে যে পাঁচালি লিখেন তারি কিছু নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হলো। যেমন:–

খলের স্বভাব অন্তরে বিষ, মুখে বলে মিষ্টি।
লোভীর স্বভাব চিরকাল পরদ্রব্যে দৃষ্টি।।
মানীর স্বভাব, নিজ দঃখের কথা পরে কন না।
অভিমানী লোকের স্বভাব, তুচ্ছ কথায় কান্না।।
নারীর স্বভাব গুপ্ত কথা পেটে রাখা দায়।
ডাইনের স্বভাব ছেলে দেখলে ঘন দৃষ্ট চায়।।
দাতার স্বভাব 'নাই' বাক্য নাহি মুখে।
হিংস্রকের স্বভাব পর সুখে মরে মনোদুঃখে।।
কৃপণের স্বভাব ক্ষুদ্র দৃষ্টি খুদটি ধরে টানে।
বালকের স্বভাব খাদ্যদ্রব্য দেবতারে না মানে।।
বাতুলের স্বভাব মিছে কথায় চারিদণ্ড বকে।
বৈদ্যের স্বভাব কিছু কিছু অহঙ্কার রাখে।।
জলের স্বভাব নীচ বিনে উর্ধ্বগামী হয় না।
পাষাণের স্বভাব শরীরে কভু দয়ামায়া রয় না।।

রামাই পণ্ডিত ও শূন্যপুরাণ

শূন্যপুরাণ গ্রন্থখানি প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের একটি কালজয়ী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে, বাংলা-সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিতদের কাছ থেকে। এ গ্রন্থখানি রামাই পণ্ডিতের সৃষ্ট বলেই প্রচলিত হয়ে আসছে। রামাই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয়েও সারাজীবন বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মিলন কামনা করে গেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এবং তাঁর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে কোথাও ধর্মের গোড়ামী পরিলক্ষিত হয় নি। তাঁর রচিত 'ধর্মপূজা বিধান' ও 'শূণ্যপুরাণ' গ্রন্থদ্বয়ে নিরঞ্জনের রুষ্মা' বা 'কালিমা জাল্লাল' নামে একটা অধ্যায় আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, জাজপুরের পূর্বদিকস্থ ব্রাহ্মণগণ ধর্ম-উপাসকদের উপর অত্যাচার শুরু করলে তার প্রতিশোধার্থে ধর্মঠাকুর যবন রূপ ধারণ করেন এবং মুসলমান বেশধারী অন্যান্য দেবদেবীগণের সহায়তায় জাজপুর ধ্বংস করেন। পাঠকদের অবগতির জন্য নিম্নোক্ত কবিতাংশটুকু তুলে দেওয়া হলো:–

ধর্মহৈয়া যবনরূপী শিরে পরে কাল টুপী
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিযা এক নাম।।
নিরঞ্জন নিরাকার হৈল ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলয়ে দম্মাদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা এক মন
আনন্দেতে পরিলা ইজার।।
ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর
আদম হৈল শূলপানি।
গণেশ হৈল কাজী কার্ত্তিক হৈল গাজী

ফকীর হৈল যত মুনি।।

....

আপনি চণ্ডিকা দেবী তিঁপু হৈল হায়া বিবি
পদ্মাবতী হল্যা বিবি নুর।
যতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে এক মন
প্রবেশ করিল জাজপুর।।
দেউল দেহারা ভাঙে কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্মের পায় রামাই পণ্ডিত গায়
ই বড় বিষম গণ্ডগোল।।

ডাক, খনা, ব্রতকথা:

ডাক:

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের অন্যতম নিদর্শন বৌদ্ধ ডাকার্ণব গ্রন্থের মূল আদর্শে লেখা ডাকের বচন। নেপালের কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "ডাকার্ণব" গ্রন্থখানি আবিষ্কার করেছেন। ডাকের বচনের মূলই হলো এই ডাকার্ণব গ্রন্থ। ডাকার্ণব হলো বৌদ্ধ গ্রন্থ।

১ : ডাকের বচনে বাংলার গৃহ এবং গৃহিণী সম্পর্কে যে সব সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে নিম্নে তারই একটা উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন:–

ঘরে স্বামী বাইরে বইসে।
চারি পাশে চাহে মুচকি হাসে।।
হেন স্ত্রীয়ে যাহার বাস।
তাহার কেন জীবনের আশ।।

২ : বিদগ্ধ মনীষীগণ ধারণা করেন যে, 'ডাকার্ণব' গ্রন্থখানি খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীতে পাল রাজগণের সময় রচিত হয়ে থাকবে। 'ডাকার্ণব' তান্ত্রিক মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা বজ্রযানী সম্প্রদায়ের রচিত গ্রন্থ। ডাকের বচন বাংলাদেশের জনগণের কাছে যেভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তাতে আমরা নির্দিধায় বলতে পারি যে, তিনি একজন মহাজ্ঞানী সাধক ছিলেন। তখনকার সমাজ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তিনি যেসব বচন সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। সমাজের মানুষ তৎসময়ে কিরূপ ভোজন বিলাসী ছিলো নিম্নে বর্ণিত তাঁর বচনে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। যেমন–

ভাল দ্রব্য যখন পাব।
কালিকার জন্য তুলিয়া না থোব।।
দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ।
ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ।।
বলে ডাক এই সংসার।
আপনে মইলে কিসের আর।।

খনা :

রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ছিলো খ্রিস্টিয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে। তৎসময়ে সংস্কৃত কবি কালিদাস ও বরাহমিহির রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার কবি ছিলেন। কথিত আছে খনা ছিলেন এই কবি বরাহের পুত্রবধূ এবং মিহির পত্নী। তিনি খুবই বিদুষী মহিলা ছিলেন। বাংলার কৃষিকর্মের উপর যে সমস্ত তথ্য তিনি রেখে গেছেন তা বাঙালি মনে বিস্ময় এর সৃষ্টি করে। তাঁর বচনের ভাষা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপ পল্টিয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। কেননা রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে ছিলো গৌড় অপভ্রংশ বা প্রাকৃত ভাষা। আর আমরা খনার বচনে যে ভাষা দেখি তা আদি যুগের ভাষা বলে ধরে নিতে পারি না। যা হোক তিনি যে, নানা বিষয়ে বাংলা ও বাংলার জনগণকে তাঁর বচন দ্বারা উপকৃত করে গেছেন এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। পণ্ডিতগণ তাঁর উপদেশাবলীগুলিকে চারভাগে ভাগ করেছেন। যেমন– ক: কৃষি-ব্যাপারে প্রথা এবং সংস্কার সম্পর্কিত: খ: আবহাওয়া-জ্ঞান সম্পর্কিত: গ: কৃষি-ব্যাপারে

ফলিত জ্যোতিষজ্ঞান সম্পর্কিত এবং ঘ: শস্যের যত্ন সম্পর্কে উপদেশ। নিম্নে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া গেলো। যেমন:–

১ : চৈত্রে কুয়া ভাদ্রে বান।
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।।

২ : যদি বর্ষে আঘনে
রাজায় বার হয় মাগনে।
যদি বর্ষে পৌষ
মেগে না পায় তূষ।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পূণ্য দেশ।

৩ : আষাঢ়ের পঞ্চদিনে রোপয়ে যে ধান।
সুখে থাকে কৃষিবল বাড়য়ে সম্মান।।

৪ : পূর্ণিমা অমাবশ্যায় যে ধরে হাল।
তাঁর দুঃখ চিরকাল।।
তার বলদের হয় বাত।
ঘরে তার না থাকে ভাত।।
খনা বলে আমার বাণী।
যে চষে তার হবে হানি।।

৫ : শুন বাপু চাষার বেটা।
বাঁশের ঝাড়ে দিও ধানের চিটা।।
দিলে চিটা বাঁশের গোড়ে।
দুই কুড়া ভুঁই বাড়বে ঝাড়ে।।

ব্রতকথা:

বাংলার হিন্দু রমণীগণ পুরাকালে নানা রূপ ব্রত পালন করতেন তাঁদের সংসার এবং পরিবারের লোকজনদের মঙ্গল কামনার্থে। এই ব্রতকথাগুলি বহু প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু নারীগণ মেনে চলতেন এবং তাঁরা নানা দেবদেবীর বিগ্রহ তৈরী করে পূজার্চণা করে প্রশান্তি বোধ করতেন। এ সব ব্রতকথা আদিযুগের বাংলার সমাজ-জীবনের স্মৃতি বহন করছে। এ হতেই বাংলার মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হয় বলে অনেক পণ্ডিতগণ মত পোষন করে আসছেন। চণ্ডিমঙ্গলকাব্যই এর প্রমাণ। যেসব দেবদেবী নিয়ে ব্রতকথার সৃষ্টি তাঁদের নাম হচ্ছে থুয়া, লাউল, ভাদুলি, সেঁজুতি ইত্যাদি। এছাড়া সুর্যঠাকুর ও শিবঠাকুর এগুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন।

থুয়া : সাংসারিক অভাব অনটন থেকে মুক্তি এবং সন্তান-সন্ততি কামনায় থুয়া দেবতার পূজা করা হতো। এসবের ভাষা ছিলো খুবই প্রাচীন। যেমন–

থু থু থুয়ন্তি।
আঘণ মাসের জয়ান্তি।।

লাউল : কৃষি বিশয়ক দেবতা।
ভাদুলী : যাতায়াত ও নৌ-বানিজ্যের মঙ্গলকারক দেবতা। ভাদুলী হোচ্ছেন স্ত্রীদেবতা। প্রাচীনকালে বাঙালির জলপথের কথা এজাতীয় ব্রতকথার মাধ্যমে অনেকটা বুঝা যায়। ভাদ্রমাসে এ দেবীর পূজা দেওয়া হয় বলে দেবীর নাম হয়েছে ভাদুলী।

সেঁজুতি : বাংলার হিন্দু কুমারী কন্যা বিয়ের আগে সেঁজুতি-ব্রত পালন করতো। যাতে তাদের বিবাহিতা জীবন সুখের হয়। এসব ব্রতকথার ভাষা অতি প্রাচীন ও দুর্বোধ্যতা ছিলো। কালের বিবর্তনে এর দুর্বোধ্যতা কাটিয়ে সহজবোধ্য হলেও প্রাচীনত্যের নিদর্শন এখনো দৃষ্টিগোচর হয়।

বাংলা লোক সাহিত্য:

পুরাকালে মানুষ যখন দলবেধে বনে-জঙ্গলে,গাছের ডালে মাচা তৈরী করে বসবাস করতো তখন থেকেই তারা মুখদিয়ে নানারূপ শব্দ করে, অঙ্গভঙ্গি করে, গোলাকারে দাঁড়িয়ে নৃত্য পরিবেশন করতো। শুকনো কাঠে কাঠে ঠুকাঠুকি করে, পাথরে পাথরে ঠুকাঠুকি করে, পত্র-পল্লবে তৈরী বাঁশি বাজিয়ে তারা নৃত্যের তাল বজায় রাখতো। এমনি করে করে বিবর্তনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে মানুষ আস্তে আস্তে কথা বলতে শিখলো, ক্রমান্বয়ে তারা ছন্দাকারে কথাবলা, গানবাঁধা, গানগাওয়া শিখলো এবং সেগুলি জনগণের মুখে মুখে একজন হতে অন্যজনে, একগোত্র থেকে অন্যগোত্রে, একগোষ্ঠী হতে অন্যগোষ্ঠীতে, এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে প্রবিষ্ট হয়ে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়লো। লোকের মুখে মুখে এ গান গীত হতো বলে ইহাকে বলা হয়ে থাকে লোকগীতি। কাব্যগাঁথা, আখ্যান-উপাখ্যান, কিস্‌সা-কাহিনী ইত্যাদি ঘরে ঘরে, গোত্রে গোত্রে, সমাজে সমাজে, এলাকা থেকে এলাকায় লোকের মুখে মুখে গীত ও আবৃত্ত হতো বলে একে বলা হয়ে থাকে লোকসাহিত্য। একজনের আচাড়-আচড়ন, ভাবভঙ্গি, চলন-বলন ইত্যাদি মুখ থেকে মুখে, লোক থেকে লোকে, সমাজ থেকে সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে মানুষের জীবনে ছোঁয়া দিয়ে, মনুষ্য-জাতির সংস্কার সাধনে সক্ষম হয়েছে বলে একে বলা হয় লোক সংস্কৃতি।

বুদ্ধিজীবি ও সুধিসমাজে লোকসাহিত্যের তেমন একটা কদর দেখা না গেলেও বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষই লোকসাহিত্য–লোকগীতির ভক্ত। তাই লোকসাহিত্য লোকসমাজের সৃষ্টি বললে এতোটুকু অত্যুক্তি হবে না। লিখিত আধুনিক সাহিত্য লোকসাহিত্যের কাছে বিশেষভাবে ঋনি। কেননা লোকসাহিত্যের আখ্যান-উপাখ্যান, কাব্য-কবিতা ইত্যাদিই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলা লোকসাহিত্যও পুরাকালের লিখিত সাহিত্যের আখ্যান-উপাখ্যান, কাব্য-কবিতা, কিস্‌সা-কাহিনী ইত্যাদির অবলম্বনে নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ করে নিয়েছে। যেমন,– রামায়ণ, ভাগবৎ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণকীতৃন, বৈষ্ণপদাবলী, নাথসাহিত্য, শাক্তপদাবলী, মঙ্গলকাব্য, ডাক, খনা ও ব্রতকথা ইত্যাদি এবং ছড়া, ব্রতের গান, মেয়েলিগান, জারি গান, সারি গান, কৃষিবিষয়ক গান, ঘাটু গান, বারমাসী গান, বেদের গান, পটুয়ার গান, ধাঁধা, পালাগান বা গীতিকা ইত্যাদি আরও অনেক। বাংলার সমাজ জীবনে এসবের মূল্য অপরিসীম। বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের মধ্যে "ময়মনসিংহ গীতিকা" ও "পূর্ববঙ্গ গীতিকা" শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে আছে। বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষের ধারণা লোকসাহিত্য সমাজের লোকমূখেই গীত হয়ে মানুষের অন্তরেই লুক্কায়িত থাকে। কথাটা আংশিক সত্য হলেও পুরোপুরিভাবে সত্য নয়। এই লোকসাহিত্যই বর্তমানকালে লোকের মুখ ও অন্তর থেকে কাগজের বুকে লিখিতভাবে স্থান করে নিয়েছে। এতে আমরা আশাবাদী যে, আমরা না থাকলেও আমাদের এ সাহিত্য কাগজের পাতায় গ্রন্থাকারে বেঁচে থাকবে।

বাংলাদেশের সমাজজীবনকে যদি দু'টি ধারায় বিভক্ত করা যায় তাহলে একটিতে আছে কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থা এবং অন্যটিতে শিল্পনির্ভর সমাজব্যবস্থা। কৃষিনির্ভর সমাজজীবনে লোকসাহিত্যের অনুভব কৃষিবিষয়ের লাভ-লোকসানের বিভিন্ন উপদেশাত্মক প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে নিহিত। এছাড়া এ জাতীয় লোকসাহিত্যে মাঠঘাটের রাখালিয়া সুরের ব্যঞ্জনা ও নদ-নদীতে ভাসমান নৌকা থেকে মাঝি মাল্লার কণ্ঠনিঃসৃত মনউদাসী বাটিয়াল-সুরের রূপমূর্ছনা ঐতিহ্যবাহী লোক সঙ্গীতের ধারাটিকে সঞ্জীবিত করে তোলে। প্রবহমান নদীর বুক থেকে ভেসে আসে মাঝিদের গাওয়া ভাটিয়ালীর সুর। যেমন:–

তরী ভাট্যায় সয় আর উজায় না
মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।

অথাবা–

কূলে কূলে ঘুরিয়া বেড়ায় আমি
পাইনা ঘাটের ঠিকানা
ডুব দিলাম না।

এই গানে, এই সুরে য়ে, শুধু পল্লীমায়ের স্নেহশীতল প্রকৃতির সুরই ভেসে বেড়াচ্ছে তা কিন্তু নয়। এতে রয়েছে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তথ্য এবং দেহতত্ত্বের আধ্যাত্মিক সুর। মাঝিরূপী মানব সারা জীবনভর নৌকা বেয়ে, কূলে কূলে

ঘুরে, পাইল না সে ঘাটের ঠিকানা, শেষের খেয়ায় পা রেখেও সে তাঁর (ঈশ্বরের) সন্ধান না পেয়ে তাঁর (ঈশ্বরের) কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

বাংলাদেশের লোকসাহিত্যকে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যমণ্ডিত করেছেন তৎকালীন কবিগণ নানা কাব্য-গীতিকা ও উপাখ্যান রচনা করে। নিম্নে প্রদত্ত ময়মনসিংহ গীতিকা হতে ২ টি এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা হতে ১ টি উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন:–

কঙ্ক ও লীলায়:–

ভাদ্র মাসের চান্নি যেমন দেখায় গাঙ্গের তলা।
বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা।।

মহুয়া গীতিকায়:–

সাপে যেমুন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।
পদ্ম ফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল।।

ভেলুয়া সুন্দরী পালায়:–

সেই ঘাটে আসিরে ভোলা দৃষ্টি করি চায়।
আকাশের চন্দ্র যেন রে ঘাটে দেখা যায়।।
এক চন্দ্র উঠে জানি রে পূর্ব পশ্চিম ধারে।
আজু কেন দেখি রে চন্দ্র দরিয়ার কিনারে।।

গীতিকাগুলোতে কেবল প্রেমের চিত্রই মুখ্য স্থান অধিকার করে নি, এগুলোতে প্রকৃতি ও মানব মনের সম্পর্কটি নিবিড় একাত্মত্য লাভ করেছে। প্রকৃতির সহৃদয় সহযোগীতায় মানবহৃদয়ের গূঢ় রহস্য ও মানবদেহের রূপলাবণ্যের এরূপ চমৎকার স্ফুরণ গ্রাম্য কবির চিত্রণ-ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। গীতিকাগুলোর ভাষা যতই সহজ ও অনাড়ম্বর হোক না কেন, এগুলো যেমন কবির সজীব কল্পনার পরিবাহক তেমনি তাঁর কাব্যভাবনা ও কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। 'আজলকাজল মেঘ' 'দাগল দীঘল কেশ' 'আগল ডাগল আঁখি' ইত্যাদি শব্দসম্ভার ময়মনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকার সমৃদ্ধি বাড়িয়েছে।

নব্য-যুগের আধুনিক বাংলা ভাষা

নব্য-যুগের কিছু পূর্বে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কবি আব্দুল হাকিম তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ "নূরনামা"-তে বাংলা ভাষার প্রতি যে দরদ দেখিয়েছেন নিম্ন লিখিত চরণ গুলিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ আমরা দেখতে পাই। যেমন-

"যে সব বঙ্গেত জন্মি হিঙসে বঙ্গবাণী।
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় ন জানি।।
মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মান হিত অতি।।
দেশূ ভাষা বিদ্যা ঘরে মনে ন জুরায়।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে ন যায়"।।

সেকাল আর একাল তা যেকালই হোক না কেনো, বাঙালি তার মায়ের ভাষায় কথা ব'লে যে, আত্মতৃপ্তি উপলব্ধি করে অন্য কোনো ভাষায় কথা ব'লে সে তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব নয়। সুতরাং জাতির পরিচয়ই হ'লো তার ভাষা। তাই, বাঙালি তার ভাষা ও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে এতোটুকু দ্বিধাবোধ করে নি।

দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ স্বরূপ কালবৈশাখীর উতাল মাতনের মতো আবির্ভূত হলেন এই বাংলার বুকে এক সৌম্য পুরুষ যাঁর হৃদয়ে ছিলো বিদ্রোহের জ্বালা, অন্তরে ছিলো ভালোবাসার ডালা। ইংরেজদের আশীর্বদপুষ্ট হয়ে যেসব **বাঙালি** জোতদার, জমিদার, অসৎ ব্যবসায়ী নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নীরিহ জনগণেন উপর চালিয়েছে নিদারুণ উৎপীড়ণ, নিঃপীড়ণ, কৃষকদের উপর চালিয়েছে নানারূপ অত্যাচার-অনাচার, অত্যাচারী এসব আমলা, ইংরেজ শাসক ও ত্রাসকদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন ও বিদ্রোহ গড়ে তুলেছিলেন তাঁর কবিতা ও গানে। বিদেশী ভাষা থেকে শব্দ চয়ণ করে এনে তিনিই পরিপূর্ণ করে দিয়ে গেছেন আমাদের প্রিয় বাংলা

ভাষার ভাণ্ডারকে। আমাদের সেই প্রিয় কবি ও জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের কবিতার কিছু অংশ তুলে দেওয়া হলো পাঠক সমাজের আত্মতৃপ্তির জন্য। যেমন–

রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্ব'লে পুড়ে যাক শ্বেত-বসন।
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন্-ঝন্।
সিঁথির সিদুঁর মুছে ফেল মা গো,
জ্বাল সেথা জ্বাল কাল চিতা।
তোমার খড়্গ-রক্ত হউক
স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা।
এলোকেশে তব দুলুক ঝঞ্ঝা
কাল-বৈশাখী ভীম তুফান,
চরণ-আঘাতে উদ্গারে যেন
আহত বিশ্ব রক্ত-বান।
অসুরে নাশিতে হউক বিষ্ণু–
চক্র মা তোর হেম কাঁকন।
টুটি টিপে মারো অত্যাচারে মা,
গল-হার হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার ধুমকেতু-জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি।
হাস খল খল, দাও করতালি,
বল হর হর শঙ্কর।
আজ হ'তে মা গো অসহায় সম
ক্ষীণ ক্রন্দন সম্বর।
মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক কর মা,
সে চাবুক কর নভ-তড়িৎ,
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝ'রে
লালে লাল হোক শ্বেত-হরিৎ।

যে কবির হৃদয়ে এতো ক্ষোব, এতো জ্বালা, এতো পুঞ্জিভূত ব্যথা, যাঁর আহ্বানে তরুণ হৃদয়ে, জেগে উঠে স্বাধীনতা। তাই তো আমাদের জিজ্ঞাস্য তিনি কী শুধুই বিদ্রোহী কবি? উত্তরে বলা যায় না। যাঁর অন্তর পরদুঃখে কাতর হয়, যাঁর হৃদয় নির্যাচিত-নিঃপীড়িত মানুষের কাঁন্নায় বিদীর্ণ হয়, ছেড়া কাগজের মতো এখানে সেখানে পড়ে থাকা জীর্ণ-শির্ণ মানুষের জন্য যাঁর হৃদয় হয় বিগলিত, তাঁকে কি করে শুধু বিদ্রোহী কবি বলি? তাঁর ভেতরে ছিলো একটা দরদী মন। যে মন কেঁদে উঠেছে বারবার এই বাংলার অসহায় পিতা-মাতা, ভাই-বোনদের জন্য। তিনি তো একজন দরদীয়া মরমীয়া কবি। তিনি একজন প্রেমের কবি। যিনি সত্য ভালোবাসাকে, প্রেম-প্রীতিকে যতন করে আপন হৃদয়ে পোষণ করে গিয়েছেন। রেখে গিয়েছেন তার নিদর্শণ কবিতার আখরে আখরে। তাই, প্রেমেরও কবি ছিলেন তিনি। যেমন–

তোমার কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান–
এইটুকু শুধু রবে পরিচয়? আর সব অবসান?
অন্তরতলে অন্তরতর যে ব্যথা লুকায়ে রয়,
গানের আড়ালে পাও নাই তার কোনদিন পরিচয়?

হয়তো কেবলি গাহিয়াছি গান, হয়ত কহিনি কথা,
গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস, মিছে তার আকুলতা?
হৃদয়ে কখন জাগিল জোয়ার, তাহারি প্রতিধ্বনি
কণ্ঠের তটে উঠেছে আমার অহরহ রণরণি'–
উপকূলে বসে শুনেছ সে সুর, বোঝ নাই তার মানে?
বেঁধেনি হৃদয়ে সে সুর, দুলেছে দুল হ'য়ে শুধু কানে?

....

বন্ধু গো যেয়ো ভুলে–
প্রভাতে যে হবে বাসি, সন্ধ্যায় রেখো না সে ফুল তুলে!
উপবনে তব ফোটে যে গোলাপ – প্রভাতেই তুমি জাগি'
জানি, তার কাছে যাও শুধু তার গন্ধ-সুষমা লাগি'।

যে কাটা-লতায় ফুটেছে সে-ফুলরক্তে ফাটিয়া পড়ি'
সারা জনমের ক্রন্দন যার ফুটিয়াছে শাখা ভরি'
দেখ নাই তারে!–মিলন-মালার ফুল চাহিয়াছ তুমি,
তুমি খেলিয়াছ বাজাইয়া মোর বেদনার ঝুমঝুমি!

ভুলো মোর গান, কি হবে লইয়া এইটুকু পরিচয়,
আমি শুধু তব কণ্ঠের হার, হৃদয়ের কেহ নয়!
জানায়ো আমারে, যদি আসে দিন, এইটুকু শুধু যাচি–
কণ্ঠ পারায়ে হয়েছি তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি!

(চক্রবাক)

মরমী কবির মরমীয়া গান,
হৃদয় গহীনে তুলেছে তান,
আমার মতো নির্বোধ প্রাণ–
কেমনে গো তাহা বুঝি?
বিরহ যাতনে জ্বলিছে যারা,
তাই শুধু তাদেরকেই খুঁজি!

বাংলা মায়ের রূপের পূজারী আর এক নিবেদিত প্রাণ কবি বাল্যকাল থেকেই মায়ের এই অপরূপ রূপ নিয়ে ভাবতেন, রূপের বিছানার মতো নরম ঘাসের উপড় বসে তিনি সারাক্ষণ চোখ জোড়াতেন। তাই তাঁর প্রথম কবিতা হতে শেষতক তিনি তাঁর কবিতায় মায়ের রূপের আচড় রেখে গেছেন সুন্দরভাবে। তাই আমরা বলে থাকি জীবনানন্দের রূপসী বাংলা। তাই কবি নজরুলের মতো তাঁকেও এই নাতিদীর্ঘ রচনায় ধরে রাখার জন্য এতোটুকু কুণ্ঠাবোধ করি নি। কবি গুরুকে নিয়ে কোনো কবি সাহিত্যিকই তেমন একটা টানা-হেছড়া করি না। কেননা তিনি বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে যতোটুকু রেখে গেছেন তা অন্য কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি। যেদিকেই আমরা অগ্রসর হতে চাই সেদিকেই তাঁর পদচারণা দেখতে পাই। কোথাও এতোটুকু ফাক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আমিও এ-রচনাতে কবি সম্রাট গুরুদেবকে টেনে আনার ধৃষ্টতা থেকে নিজেকে আবডালেই রাখলাম। এখন কবি জীবনানন্দের রূপসী বাংলা থেকে কয়েকটা চরণ তুলে ধরছি বিজ্ঞ পাঠক সমাজের জন্য। যেমন–

এক :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দয়েলপাখি–চারি দিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম–বট–কাঁঠালের–হিজলের–অশথের করে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল–বট–তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে–
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জোছনা যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়–
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল–একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

দুই :

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে–এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়–হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠালছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হব–কিশোরীর–ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারা দিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়–রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে–

বর্তমান প্রজন্মের কবি সুব্রত অগাষ্টিন গোমেজ বিরোচিত কবিতা-গ্রন্থ "তনুমধ্যা"-র তামাদি কবিতার কয়েকটি চরণ পাঠক-পাঠিকাদের মনরঞ্জনের জন্য তুলে ধরা হ'লো। যা আদি চর্যাপদ ও বর্তমান আধুনিক কবিতার ক্রমবিবর্তনের ধারা সূচিত করবে। যেমন,–

একবার শখ হলো বীজ ভেঙে ভিতরে তাকাইঃ
তাতেই অনর্থপাত, এখানে যা চাই তা তো নাই!
পেণ্ডলাম ফণা দোলে কাঁচা-পাকা দুই অন্ধকারে;
টিকি খাড়া হয়ে যায় অগ্নিশর্মা তালুতে আমার।
আলো ফুঁড়ে উড়ে এলো জনা তিন উদার পুরুষ-
একজন চোখে দিলো সুরম সুরমা-তিনদিকে
ইহা আলো না অন্দকার-গুলে গ্যালো সকল' হদীস;
তখন আরেকজন ধূয়ে দিলো পথিক চরণ,
ভূমিতে সটান শুয়ে অতপর হয়ে গ্যালো পথ;
বোচঁকায় কম্বল দিলো, হাতে লাঠি, তৃতীয় পুরুষ,
এবং আমার যাত্রা রাতরাত অগস্তোর পিছে।
মেরুদিন থামে মেরুরাতের স্টেশনে-তিনজন
নেমেই গা-ঢাকা দিলো তালতাল কল্কি অবতারে।
অনেক দুঃস্বপ্ন হেটে বুঝে যাই ডিম্বাকার সব,
আপন বোধির তলে জেগে উঠি দুরন্ত মনসুর-
বীজ ভাঙি-নিজেকেই খুঁজে পাই বীজের ভিতর।

মানুষ আমরা। যতই শক্তিশালী হই না কেনো, আমরা একটা গণ্ডির ভেতরই ভ্রমণ করি, একটা বৃত্তের ভেতরই রয়েছে আমাদের সীমা। সে সীমা আমরা অতিক্রম করতে পারি না। যতই আমরা সীমা ছেড়ে অসীমের সন্ধানে অগ্রসর হই, ঘুর্ণিপাকে ঘুরপাক খেতে খেতে চোখ মেলে দেখি, সেই বৃত্তের মধ্যেই রয়েছে আমাদের কেন্দ্র, সীমার মাঝেই সীমিত রয়েছে আমাদের ভ্রমণ, উপায় নেই সে সীমার বেস্টনী বেধ করে বেড়িয়ে যাবার। শুধু বৃত্ত নেই তাঁর, সীমা নেই তাঁর, যিনি অসীম, যাঁর নিয়োতিতন্ত্রে বাঁধা এ-ভুবণ। আমরা তাঁর করসূত্রধৃতপুত্তলিকা মাত্র।

কালের পরিক্রমায়
বাংলাদেশ–বাঙালি ও বাংলাভাষা
(২য়: পর্ব)
ভাষা আন্দোলন

সত্যিকার অর্থে বাংলা ভাষার আন্দোলন হ'য়েছিলো দু'দফায়। প্রথম : ১৯৪৮ সালের মে মাসে এবং দ্বিতীয় বার ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৯৪৮ সালের ২১ শে মার্চ প্রথম ও শেষ বারের মতো জিন্নাহ্ সাহেব ঢাকা আসেন এবং ঐ দিনই রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দান কালে তিনি ঘোষণা দেন যে,– "উর্দু, এবং একমাত্র উর্দুই হ'বে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"। প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'নো'- ব'লে চিৎকার ক'রে উঠে এবং সাথে সাথে সারা ময়দান 'নো'- 'নো'- 'নো' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হ'য়ে উঠে। জনতার সে দুর্বার গর্জনে সেদিন জিন্নাহ সাহেব ভর্কে যান এবং তড়িঘড়ি সভা শেষ ক'রে সেখান থেকে কেটে পড়েন। এর পর ২৪শে মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণ দান কালে তিনি আবারও ঘোষণা করলেন,– 'বাংলা ভাষা আন্দোলনের পিছনে পঞ্চমবাহিনীর হাত রয়েছে' সুতরাং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তখনই ছাত্ররা 'নো'-'নো'-'নো' ব'লে চিৎকার শুরু করেন এবং হলের সবাই মারমুখো হ'য়ে উঠেন। ছাত্রদের এধরণের মনোভাবে জিন্নাহ সাহেব হতভম্ব হ'য়ে পড়েন। বলা বাহুল্য যে, এখান থেকেই শুরু হয় বাংলার ভাষা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম।

১৯৪৮ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বার জিন্নাহর মৃত্যুর পর খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের নয়া প্রধানমন্ত্রী হ'লেন। এবং জনাব নুরুল আমিন সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে নাজিমউদ্দিনের স্থলাভিষিক্ত হ'লেন। ১৯৫২ সালের ২৬ শে জানুয়ারি খাজা সাহেব ঢাকার পল্টন ময়দানের এক জনসভায় এমর্মে ঘোষণা করলেন যে, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"। এতে সমগ্র পূর্ববঙ্গে ছাত্রসমাজের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'লো। এবং এরই প্রেক্ষিতে ঢাকার বার লাইব্রেরীতে গঠিত হ'লো "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ"। সেদিন এই কর্মপরিষদ ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে "রাষ্ট্রভাষা দিবস" হিসেবে ঘোষণা করলেন। কেননা ঐদিন পূর্ববঙ্গ ব্যাবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার জন্য ধার্য হ'য়েছিলো।

১৯৪৭ সালের ১৭ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত এক উর্দু সম্মেলনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব চৌধুরী খালেকুজ্জামান সর্বপ্রথম ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ২৯ শে জুলাই জ্ঞান-তাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দৈনিক আজাদ পত্রিকায় পাকিস্তানের "ভাষা সমস্যা" শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার মর্ম হ'লো এই,–"পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগোষ্ঠির মাতৃভাষা বাংলা হওয়ার জন্য বাংলাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। 'যদি এর পরেও অন্যকোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের কথা উঠে শুধু তা হ'লেই উর্দুর কথা চিন্তা করা যেতে পারে"। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে পাকিস্তানের তদানীন্তনকালের বাঙালি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের সুপারিশ ও তা কার্যকরী করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানান। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ব্যপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ "পূর্বপাকিস্তানের ভাষা সমস্যা" শিরোনামে আরও একটি নিবন্ধ লিখেন যা ১৯৪৭ সালের ২১শে ডিসেম্বার দৈনিক আজাদে প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেন,– "যাহারা বাংলা ভাষাকে ছাড়িয়া কিংবা বাংলার স্কুল-কলেজের শিক্ষার মাধ্যম (মিডিয়া) রূপে অথবা বাংলাদেশের আইন-আদালতে ব্যবহার্য ভাষা রূপে উর্দুর পক্ষে ওকালতি করিতেছে, আমি তাহাদিগকে কান্ডজ্ঞানহীন পন্ডিতমূর্খ ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না"। এতে আমরা স্পষ্টই উপলব্দি করতে পারি যে, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা পশ্চিম পাকিস্তানী অবাঙালিদের বহু-পূর্ব পরিকল্পীত ছিলো। তাই পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথেই বাঙালিদের উপর তাদের বৈমাত্রীয়-সুলভ আচরণ বিশেষ লক্ষনীয়।

মহান একুশের ঘটনাবলী

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ২১ শে ফেব্রুয়ারি সর্বাত্মক হরতাল পালনের ব্যাপারে ছাত্ররা ছিলেন ধৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ২০ শে ফেব্রুয়ারি মুসলিম লীগ সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। সঙ্গে সঙ্গে সকল ছাত্রাবাস প্রতিবাদ মুখর হ'য়ে উঠে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের নেত্রীবর্গ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এই মর্মে ঘোষণা দেন যে, এর

বিপরিত সিদ্ধান্ত হটকারিতার সামিল হ'বে ও পূর্ব পাকিস্তানের আগামী গনপরিষদের নির্বাচন ব্যহত হবে। কিন্তু বিরোধী ছাত্র নেতারা তাঁদের এ নির্দেশ উপেক্ষা ক'রে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। কুহেলিকা ঘেরা যামিনীর হাড় কাঁপানো শীতকে উপেক্ষা ক'রে তাঁরা হল সংলগ্ন পুকুর পাড়ে উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসে জরুরী এক সভায় ২১'এর কর্মসূচি প্রনয়ন করেন। তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। (ক) : এক সাথে কোনো বিরাট মিছিল বার করা যাবে না। কেননা তা ভীষণ ঝুকিপূর্ণ হবে। দশ জন ক'রে এক এক গ্রুপে দফায় দফায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হ'বে এবং কোনো রকম প্রতিবাদ না ক'রে সেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ করা হবে। (খ) : ২১ শে ফেব্রুয়ারি ঠিক বেলা ১১ টা হ'তে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ শুরু হবে।

১৯৫২'র ২১ শে ফেব্রুয়ারি। প্রায় দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর একত্র সমাবেশ। "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরীত। ঘড়ির কাটা টিক্ টিক্ ক'রে এগিয়ে চলছে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। বেলা ১১ টা বাজার সংকেত ধ্বনি। শুরু হ'লো একের পর এক দশ'জনি মিছিল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ। ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর শুরু হ'লো পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস এবং গ্রেপ্তার। পুলিশি নির্যাতন কিছুক্ষণ সহ্য করার পর ছাত্ররাও মারমুখো হ'য়ে উঠলো। শুরু হ'লো বৃষ্টির মতো ইষ্টক নিক্ষেপ। বেলা দু'টোর দিকে অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটলো। ছাত্রদের ইষ্টক বর্ষণে পুলিশ বাহিনী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ছাত্রজনতা তখন এতো মারমুখো হয়েছিলো যে, টিয়ার গ্যাসের তাজা শেলগুলি ধ'রে তারা পুলিশের দিকে ছুড়ে মারতে এতোটুকু দ্বিধাবোধ করেনি। অবস্থার এমনিতর অবনতি দেখে মুসলিম লীগ সরকারের অবাঙালি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরেশীর নির্দেশক্রমে কোনো রকম হুশিয়ারী সংকেত না দিয়েই বেলা ঠিক ৩টা ১০মি: এর সময় নিরস্ত্র ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর শুরু হ'লো পুলিশের গুলি বর্ষণ। বাংলার বুকে ঘটে গেলো এক নজির বিহিণ ঘটনা। মায়ের ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার্থে এই সর্বপ্রথম রক্ত দান। দামাল ছাত্ররা তাঁদের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে বিশ্ব-বিবেককে চমকিত ক'রে দিলো।

সে দিন সর্বমোট কতো জন ছাত্র-জনতা প্রাণ দিয়েছিলেন তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। কেননা পুলিশ-বাহিনী সেদিন পুলিশ-ভ্যানে অনেক লাশ তুলে নিয়ে গিয়েছিলো যার কোনো সন্ধান আজ তক মিলে নি। শুধু দু'টো লাশ ছাত্ররা নিয়ে গিয়েছিলো হাসপাতাল মর্গে এবং আহতদের মধ্যে রাতে আরও দু'জন ছাত্র মারা যান। সর্বমোট এই চারজনের কথাই জনগন জানতে পারেন। এ-চার জনের তিনজন হ'লেন ছাত্র। যথাক্রমে তাঁদের নাম : রফিক (রফিক উদ্দিন আহমদ), বরকত (আবুল বরকত), জব্বার (আব্দুল জব্বার) এবং একজন হ'লেন অছাত্র। তাঁর নাম : সালাম (আব্দুস সালাম)। ২১ শে ফেব্রুয়ারি দিবাগত গভীর রাতে পুলিশ ও সৈন্য বাহিনীর সদস্যরা যৌথভাবে আক্রমন চালিয়ে হাসপাতাল মর্গ হ'তে লাশগুলি নিয়ে যায়। তবে রক্তাক্ত এই বিয়োগান্তক নাটকের এখানেই শেষ নয়। ২২ শে ফেব্রুয়ারি শহীদদের রক্তমাখা কাপড় নিয়ে ছাত্ররা বিরাট এক মিছিল বার করেন এবং সাধারণ জনতা ও শ্রমিকরা এই মিছিলে যোগ দেন। সেনা বাহিনী মিছিলকে চত্রভঙ্গ করার জন্য মিছিলের উপর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে দেয়। তাতে সে মিছিলের দু'জন লোক মারা যান। এছাড়া সেনা বাহিনীর গুলিতেও সেদিন আর দু'জন নিহত হন। তাঁরা হ'লেন শফিউর রহমান (ঢাকা হাইকোর্টের কর্মচারী ও আইন ক্লাশের ছাত্র)। তাঁকে গুলি করা হয় ঢাকার রথখোলার মোড়ে। আর একজন হ'লো ১০ বছরের এক বালক, নাম : অহিউল্লাহ। সেও নবাবপুরে নিহত হয়। তারপর সারা দেশে শুরু হয় সংগ্রাম, মিছিল ও হরতাল। মুসলিম লীগ সরকারের শাসন যন্ত্র দুর্বার ছাত্র-জনতার চাপের মুখে ভেঙ্গে পরে।

২২ শে ফেব্রুয়ারি রাতে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা গুলিবর্ষণের জায়গায় রাতারাতি একটা শহীদ মিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বদরুল আলম ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ১০ ফুট উচু ও ৬ ফুট চওড়া মাপের ঢাকা বাহাদুর শাহ পার্কের শহীদ মিনারের অনুরূপ ডিজাইনের একটা শহীদ মিনারের ডিজাইন করেন এবং রাতারাতি তাঁরা প্রস্তাবিত শহীদ মিনার নির্মাণ করেন। ইহাই হ'লো ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সর্ব প্রথম মিনার। এ প্রসঙ্গে, জনাব রফিকুল ইসলামের ১৯৮১ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক রোববারে লেখা "একুশের শহীদ ও স্মৃতির মিনার" প্রতিবেদনটি তুলে ধরা হ'লো। তিনি লিখেছেন :-

"শহীদ মিনারের নক্শা বদরুল আলম ও সাঈদ হায়দারের। সে সময় মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস দোতলা করার জন্য ইটের পাঁজা ছিলো, ঐ ইটের মালিক ছিলেন কন্ট্রাক্টর এম, এ, মুতালিবের পুত্র এম, এ, জহির। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হ'লে তিনি মাল-মশলা, রাজমিস্ত্রীর ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। হোস্টেলের তিন-চার শত ছাত্র লাইন ক'রে দাঁড়ালো, ছাত্রদের হোস্টেল থেকে ১২ নং হোস্টেল ব্লক প্রায় ৪০০ গজ; ছেলেদের হাতে-হাতে ইটের পর ইট যেন উড়ে আসতে লাগলো। বাহান্নর ২৩ শে ফেব্রুয়ারি রাতারাতি ছাত্র-জনতা দশ ফুট উঁচু ও ছয় ফুট চওড়া শহীদ স্মৃতি-স্তম্ভ বা মিনারটি নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করলো। এই মিনারটি স্থাপিত হয়েছিলো ১২ নং ব্লকের পাশে যেখানে বাংলা ভাষার জন্য প্রথম বাঙালির রক্ত ঝরেছিলো ঠিক সেখানে। শহীদ শফিউর রহমানের পিতা পরদিন ২৪ শে ফেব্রুয়ারি সকালে এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীন ২৬ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারটি উদ্বোধন করেন। ২৪ শে ফেব্রুয়ারি সকাল

থেকে ২৬ শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ন এই শহীদ মিনার হ'য়ে উঠেছিলো বাঙালীর তীর্থক্ষেত্র। ফুলে-ফুলে এটিকে ঢেকে দেয়া হয়েছিলো; একজন মা তাঁর মেয়ের গলার হার খুলে দিলেন মিনারের পাদদেশে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য, যা দেশ ও জাতির অভিজ্ঞতায় অভিনব। কিন্তু পুলিশ ও সামরিক বাহিনী ২৬ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারটিকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলো, অবশিষ্ট রইলো শুধু স্মৃতির মিনার আর ১২ নং ব্লকের বেড়ার গায়ে পোস্টারে রবীন্দ্রনাথের অমর উচ্চারণ,

'বীরের এ রক্তস্রোত
মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি
ধরার ধুলায় হবে হারা?"

(অমর একুশের প্রথম কবিতা)

ঢাকা ছাত্রদের ওপর গুলি বর্ষণের পর প্রথম কবিতা লিখেন চট্টগ্রামের ছাত্র নেতা কবি মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী। তাঁর রচয়িত কবিতা "কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি", ২১ শে ফেব্রুয়ারিতেই লেখা হয়। এবং এই দীর্ঘ কবিতাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার সাথে সাথেই এ-পুস্তিকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বাজেয়প্ত করেন। পরে কবির স্মৃতি থেকে উদ্ধার কৃত ১৮টা পংক্তি মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তাঁর কবিতার কয়েকটি চরণ পাঠক সমাজের জন্য তুলে ধরা হ'লো। যেমন :-
"এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার ঊর্ধ্বমূখী কৃষ্ণচূড়ার নীচে
যেখানে আগুনের ফুলকীর মতো
এখানে ওখানে জ্বলছে রক্তের আলপনা,
সেখানে আমি কাঁদতে আসি নি।
আজ আমি শোকে বিহ্বল নই,
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই,
আজআমি রক্তের গৌরবে অভিষিক্ত।...
যারা আমার অসংখ্য ভাই-বোনকে হত্যা করেছে,
যারা আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যময় ভাষায় অভ্যস্ত
মাতৃসম্বোধনকে কেড়ে নিতে গিয়ে
আমার এইসব ভাই-বোনদের হত্যা করেছে
আমি তাদের ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।"...
(রফিকুল ইসলামকৃত "ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার")

অমর একুশের প্রথম গান

"আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ও সুরকার আলতাফ মামুদের সুরারোপিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের প্রথম ও শেষের কয়েকটা ছত্র পাঠক সমাজের জন্য তুলে দেওয়া হলো।"

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাংানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।।
জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশুহত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই

একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।
তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুন আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।।

উপসংহারঃ

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়েছিলো "ভাষা দিবস" হিসেবে। আর ২০০০ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র বিশ্বের ১৮৮ টি দেশে পালিত হয় "আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস" হিসেবে। এই সিদ্ধান্ত হোচ্ছে জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান "ইউনেস্কো"-র। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সমগ্র বিশ্ব-ব্যাপী বাংলাভাষা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে। বাংলা ভাষার এই গৌরবময় অবস্থানের জন্য যুগে যুগে যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, যাঁরা কারা-বরণ করেছেন, অনষণ করেছেন এবং সর্বোপরি যাঁরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে শহীদ বরণ করেছেন তাঁদের প্রতি রইলো আমাদের স্বশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সমাপ্ত

সহকারী পুস্তক :–
(ক) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ (আজহার ইসলাম)।
(খ) ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস (এম আর আখতার মুকুল)।
(গ) অন্তউড়ি (আধুনিক বাংলা পদ্য-রূপান্তরে চর্যাপদ : সুব্রত অগাষ্টিন গোমেজ)।
(ঘ) তনুমধ্যা (সুব্রত অগাষ্টিন গোমেজ)।
(ঙ) বাঙালি যুগে যুগে (প্রথম খন্ড : নাজির আহমদ)।

ক্রম বিবর্তনে

বাঙালির জয়-পরাজয়

সুশীল জন গোমেজ

কিছু কথা

নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। সবুজের দেশ বাংলাদেশ। অতি প্রাচীনকাল থেকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা জুরে গ'ড়ে উঠেছিলো এ-দেশ। এই দুই মহানদী সমতটে এসে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হ'য়ে সাগর সঙ্গমে মিলিত হ'য়েছে। এ-দুই নদীর পলিদ্বারা স্বর্ণপ্রসূ হ'য়েছে বঙ্গ-জননী। বাংলার স্বর্ণালী আঁশ, সোনালী ধান, নানারকম ফল-মূল ও ফুলের সমারোহে এবং বাংলার ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হ'য়ে যুগ যুগ ধ'রে চলেছে বাংলা মায়ের বুকে নানা দেশের নানা জাতির আনাগুনা। তারা এসেছে, লুঠ করেছে, অত্যাচার করেছে, ধর্ষণ করেছে বাংলার শান্তিপ্রিয় মানুষকে। রাজ্য বিস্তার করার প্রয়াস করেছে। কিন্তু স্থায়ীভাবে কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি এই অকুতোভয় বাঙালিদের শাসন করতে। তাই তারা বেশীর ভাগই এ-দেশের প্রকৃতির রসে সিক্ত হ'য়ে, দোয়েল-শ্যামা-পাপীয়ার কলতানে মুগ্ধ হ'য়ে, এ দেশের রসালো ফলমূল ভক্ষণ করে, এ দেশের জলবায়ু পাণ করে, ক্রমান্বয়ে বাঙালির সাথে লীন হ'য়ে গিয়েছে; হ'য়েছে বাঙালি। তাই বাঙালি হ'লো শঙ্কর জাতি।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী ও কালিগঙ্গা প্রভৃতি নদীর আশীর্বাদপুষ্ট হ'য়ে এ-দেশ যেমন হ'য়েছে সুশ্যামল ও স্বর্ণপ্রসূ আবার এই নদী সমুহের রুদ্ররূপ ও ভাঙ্গনে অনেক জনপদ ও সমতট হ'য়েছে বিলীন, জনজীবন হ'য়েছে ক্ষত-

বিক্ষত-দুর্বিসহ। প্রকৃতির এই রুদ্র ও আদ্র পরিবেশ এবং নানা জাতির সংস্কৃতি ও কৃষ্টি দিনদিন বাঙালি মনে প্রভাব ফেলেছে ভীষণভাবে। সেজন্যই বাঙালিদের মধ্যে যে মিশ্র চরিত্র ও প্রতিক্রিয়া গ'ড়ে উঠেছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন একটা দেখা যায় না। বাঙালি বুদ্ধিদীপ্ত অথচ ভাবপ্রবন, শৌর্য-বীর্যমন্ডিত অথচ নিষ্ঠাবিমুখ, একদিকে বিশয়ের চিন্তায় উন্মত্ত অন্যদিকে নির্লোভ গৃহত্যাগী বাউল-ফকির, কখনো বজ্রকঠিন, কখনো হৃদয়ানুভূতিতে আপ্লুত, কখনো রুদ্র-রুক্ষ, কখনো সুশীল-শীলাচরণে মোহিত।

এই দ্বৈত-স্বভাব প্রসূত বাঙালির একটা অংশ সেই পুরাকাল থেকেই নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য প্রতিপত্তির জন্য প্রভুদের দাসত্ব , তাবেদারী ও দালালি ক'রে আসছে। আমাদের আঠারোগ্রাম অঞ্চলও এ রাহুগ্রাস মুক্ত ছিলো না। এখানকার হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যেও এ-রোগের প্রবণতা দেখা দিয়েছিলো ভীষণভাবে। তাঁরাও রাতারাতি ভাগ্যোন্নয়নের জন্য, একটা ভালো চাকরী বাগানোর জন্য, প্রতিপত্তি ও মান-সম্মানের জন্য বাপ-দাদার পদবী ইছামতি গাঙ্গে বিসর্জণ দিয়ে হিন্দু, ইংরেজ ও মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর পদবীতে ভূষিত হতে এতোটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি। প্রতিপত্তিশালী মুসলমানরাও তখন সৈয়দ, শেখ, মির্জা, খাঁন, চৌধুরী, পাটুয়ারী ইত্যাদিতে ভূষিত হতে লাগলেন, হিন্দুরা হিন্দুয়ানী বাদ দিয়ে ইংরেজি কায়দায় নিজেদের ভূষিত করলেন যেমন: চট্টোপাধ্যায় হলো চ্যাটার্জি, বন্দ্যোপাধ্যায় হলো ব্যানার্জি, গঙ্গ্যোপাধ্যায় হলো গ্যাঙ্গুলী, দত্ত হলো ড্যট্ট আর খ্রিস্টানদের মধ্যেও দেখা গেলো গোমেজ হলো গাঙ্গুলী, মিস্ত্রি হলো মিত্র, ধনা হলো দত্ত, ইংরেজি কায়দায়ও অনেকে ভূষিতো হলেন যেমন ফিলিপস্, জনস্, গমস্, বেনস্, সুযোগ বুজে মুসলমানী পদবীকে তারা বাদ দিলেন না যেমন মুন্সি, খান, চৌধুরী এবং এসব বিশ্বাস ঘাতকরাই স্বজাতির সাথে করেছে বিশ্বাসঘাতকতা। এই বিশ্বাসঘাতক-কর্মবিমুখ বাঙালি জমিদার, জোতদার, তাবেদার ও রক্ষণশীলদের অকল্পণীয় শোষণ-ত্রাষণ, নির্যাতন-নিঃষ্পেষণের ফলে সাধারণ বাঙালিদের অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হ'য়েছে এই বাংলার বুকে। মোঘল ও ইংরেজ শাসনামলেই এসব নেক্কারজনক নাজুক পরিস্থিতির উন্মেষ ঘটেছে চরমভাবে। একদিকে সাধারণ বাঙালি অন্নাভাবে করেছে ত্রাহি-ত্রাহি, করেছে সন্তান-সন্ততি বিক্রয়। অন্যদিকে এই তাবেদার ও দালাল গোষ্ঠী টাকার স্তুপের উপর ব'সে হেসেছে পুষ্পের হাসি। ধনশালী-বিত্তবান বৃদ্ধদের ঘরে-ঘরে তখন দেখা গিয়েছে তরুণী ভার্য্যা। এদের কটাক্ষ ক'রে তৎকালে রচিত হ'য়েছে অনেক প্রহসন, কবিতা ও নাটক। যেমন, দীনবন্ধু মিত্রের "বিয়ে পাগলা বুড়ো", ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের "কলিকাতা কমলালয়", "নববাবু বিলাস", রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন কুল সর্বস্ব", মাইকেল মধুসুধনের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ", এবং কবি প্রেমধন অধিকারী, উপরোক্ত অন্যায়-অনাচারে বিম্মিত হ'য়ে বেদনা-বিদুর ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গেয়েছেন:-

"কি না বল হয় টাকায়!
হেন কাজ নাইক ধরায়,
টকায় যা না সাধা যায়।
টাকাতে হাসায় কাঁদায়,
ভেলকী লাগায় সব কথায়।।
টাকার জোরে আর কি বল,
বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ হয়।
থাকলে টাকা সবাই মানে,
নৈলে কেবা কথা কয়।।
পরের ছেলে টাকা পেলে,
বাবা বলতে আগে চায়।
টাকার তরে সবাই পাগল,
হায়রে টাকা হায়রে হায়"।।

ইংরেজরা ভেবেছিলো যে, এসব শোষক শেণীকে বাঁচিয়ে রেখে সাধারণ বাঙালিদের শাসন ও শোষণ করা সহজ হবে। কিন্তু তাদের এ চিন্তাধারা ফলপ্রসূ হ'লো না। ইংরেজদের প্রতি সাধারণ বাঙালির ঘৃণা দিন দিন বেড়েই চললো। তারা ইংরেজের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুললো। দেশে সৃষ্টি হ'লো অরাজকতা ও বৈষম্যমুলক অবস্থা। শুরু হ'লো ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

এ সব বাঙালির শৌর্য-বীর্যে মোহিত হ'য়ে মহামতি গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে যেখানে বলেছিলেন, " What Benhal thinks today India thinks tomorrow." (বঙ্গদেশ আজ যা চিন্তা করে ভারতবর্ষ তা চিন্তা করে কাল)। সেখানে উপরোক্ত তাবেদার ও কর্মবিমুখ বাঙালিদের কটাক্ষ ক'রে প্যাটেল ভাই বোম্বে ভাষণে দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "The Bengalees are a race of lazy and unenterprising thinker, they eat too

much, sleep too long, take too much and work too little." (বাঙালি জাতি হ'লো অলস এবং চিন্তা-বিবর্জিত, তারা অতিরিক্ত ভোজন-বিলাসী, অতিশয় বিলাসপ্রিয়, বিশয়ের উদগ্র বাসনা কিন্তু কর্মবিমুখ)। রবি ঠাকুরও এদের কটাক্ষ ক'রে বলেছেন,

(ক)- "মাথায় ছোট বহরে বড় বাঙালি সন্তান"।

(খ)- "সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি"।

স্বামীজী বিবেকানন্দ বাংলার এই অবক্ষয়িত সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্য, জ্বালাময়ী কবিতা লিখে, গান লিখে, বাংলার তরুণ-তরুণীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন অকল্পনীয়ভাবে। যেমন,

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন শিহরে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ সব ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে।"

কম্পানীর দালাল এই শোষক শ্রেণীর শোষনে ও ইংরেজদের চক্রান্তে ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে সৃষ্ট ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার দেড় কোটি মানুষ খাদ্যাভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৫০ বঙ্গাব্দে পঁঞ্চাশের মন্বন্তরে পঁঞ্চাশ লাখ মানুষ অকালে জীবন দিয়েছেন। তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর কালে, ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৮১ বঙ্গাব্দে। এ-মন্বন্তরেও ত্রিশ লক্ষ নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ ক্ষুধার যাতনে জ্বলে মরেছে। বাঙালি জাতির এ-স্বভাবের জন্যই তাদের মার খেতে হ'য়েছে বারবার-আরবার। তাই,- উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের লীলাভূমি হ'লো বাংলাদেশ এবং উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের শিকার হ'লো এই বাঙালি জাতি। তারই নাতিদীর্ঘ কিছু ঘটনাবলীর অবতারণা করার প্রয়াস রাখি।

বাঙালির প্রথম বিজয়ঃ–

৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দেয়। এবং এই সুযোগে প্রতিবেশী দেশগুলি একের পর এক বাংলাদেশ আক্রমণ করতে শুরু করে। প্রথমে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা এ-দেশ আক্রমণ করেন, পরে কাশ্মীর রাজ্যের জয়পীড় এবং নেপালরাজ দ্বিতীয় জয়দেব এ-দেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। তখন বাংলা সাহিত্যের প্রচুর বিপর্যয় ঘটে। কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন স্থিত থাকেনি। রাজা হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে বাংলায় শান্তি ফিরে আসে। বাঙালি তার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায় এবং সাহিত্য চর্চায় মননিবেশ করে। () কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল রাজত্ব সুনেতৃত্বের অভাবে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হ'য়ে যায়। দেশের মধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তখন দেশ বর্হিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হ'তে থাকে। শক, হুন, গুর্জরদের আক্রমণ বাংলাদেশ তথা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পরে। অন্য দিকে আর্য ব্রাহ্মণদের আক্রমণ ইত্যাদির ফলে এক বাংলাদেশ সহস্র রাজ্যে বিভক্ত হ'য়ে মারামারি-কাটাকাটি শুরু ক'রে দেয়। এবং এই অরাজকতা প্রায় ১০৩ বছর ধরে চলতে থাকে। বাংলার সাহিত্য চর্চা এসময়ে বিঘ্নিত হ'য়ে পরে বহুলাংশে। বাংলার এই দুর্দিনে বাংলার বুকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল নামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। বাংলার জনগণ মিলিতভাবে তাঁকে রাজা নির্বাচন করেন। ভারতের বিশাল ভূখন্ডে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজা নির্বাচন এই প্রথম। তাঁর দ্বারাই বাংলার বুকে পাল রাজত্বের অভ্যুদয় ঘটে। পাল রাজাদের আমলে দেশের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক দুর্দশা যেমন দূরীভূত হয়, তেমনি দেশের সাংস্কৃতিক জীবন ধারারও সমৃদ্ধি সম্ভব হয়। দেশের নিজস্ব ভাবসম্পদ ও বৈশিষ্ট্যের চমৎকার স্ফুরণ ঘটে এই সময়। পাল বংশীয় রাজাগণ ছিলেন বাঙালি এবং তাঁদের রাজধানীও ছিলো বাংলাদেশে 'জয়কর্মান্ত বসাকে'। পাল রাজাগণ ছিলেন উদার ও সুশাসক। পাল রাজত্বকালে বাংলার আকাশে নতুন সূর্যের উদয় হয়। দেশের কৃষি, শিল্প, স্থাপত্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিক্ষার উন্নতি সাধিত হয়। এজন্যই ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দকে বাঙালির পথম বিজয় হিসেবে গণ্য করা হয় যা ইতিহাস স্বীকৃত।

বাঙালির দ্বিতীয় বিজয়ঃ–

১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হাবশী সুলতানদের অত্যাচারে অতীষ্ট হ'য়ে বাংলার জাগ্রত জনমত নিজেদের রাষ্ট্রীয় অধিকার কায়েম করে এবং আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্‌কে সুলতান নির্বাচন করে। বাঙালির এই নির্বাচন যে, সঠিক হ'য়েছিলো তা সর্বজন বিদিত। সুলতান আবিসিনিয়দিগকে দেশ হ'তে বিতাড়িত করলেন, খোজা প্রহরীদের সকল ক্ষমতা লুপ্ত করলেন। তিনি বিহার, আসাম ও কোচবিহার জয় করলেন। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে তিনি সকল মানুষকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে ধাবিত করলেন। তাঁর সুশাসনে বাংলা ভাষা ও

সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হ'লো। বাঙালি আর একবার দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লো। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিজয় সুচিত হ'লো। তিনি অসাম্প্রদায়িক শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর কাছে মানুষে, মানুষে কোনো ভেদাভেদ ছিলো না। হিন্দুগণ তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ব'লে অবিহিত করতেন। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁকে 'নৃপতি তিলক' ও 'জগত-ভূষণ' নামে আখ্যায়িত করেছেন। () তাঁর সময়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবন যথেষ্ট অগ্রগতির পথে ধাবিত হয়। ইহাই হ'লো বঙালির দ্বিতীয় বিজয়। হুসেন শাহী বংশের বিলোপ সাধন হ'লে বাংলাদেশ সুরবংশীয় শের শাহের অধিনে চলে যায়। শের শাহ্ও খুবই বিচক্ষণ ও সাহসী নৃপতি ছিলেন। তিনি নিজ হাতে একটি ব্যাঘ্র হত্যা করে শের উপাধিতে ভূষিত হন। বাংলাদেশে অনেক জনহিতকর কার্য সম্পন্ন করেন, যেমন: প্রজাদের যাতায়াতের সুবিধের জন্য বড় বড় রাস্তা ও সেতু স্থাপন করেন, পথচারীদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও বিশ্রামের জন্য তিনি রাস্তার দুপার্শ্বে দির্ঘীকা খনন, বৃক্ষ রোপন ও সরাইখানা স্থাপন করেন। ডাক সরোবরাহের সুবিধার্থে তিনি ডাকহরকরার প্রচলন করেন। এসব জনহিতকর কাজ করে তিনি বাংলার বুকে অমর হয়ে আছেন। তিনি তাঁর উদারতা ও কর্ম দ্বারা বাঙালির হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শের শাহের পতনের পর মোঘলদের রাজত্ব শুরু হয়। তখন পুনরায় বাংলাদেশের শান্তি বিঘ্নিত হয়। কেননা তখন আবগান ও মোঘলদের মাধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকে ভীষণভাবে। যার ফলে জনজীবনের ওপর নেমে আসে অভিশাপ। বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য, স্থাপত্য, শিল্প ও শিক্ষার প্রসার ব্যহত হ'তে থাকে। মোঘলরা ছিলো বাঙালিদের ওপর নাখোশ। সেই সুযোগে মগ, ঠগী, বর্গী ও পর্তুগীজ দস্যুদের উপর্যুপরি আক্রমণে বাংলার ব্যবসা-বানিজ্য সব লন্ড-ভন্ড হ'য়ে ভেঙে পরে। বাংলার বুকে চলতে থাকে লুণ্ঠন,ধর্ষন ও নির্যাতন। পরে মোঘল শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁর চেষ্টায় শান্তি ফিরে এলেও তা বাঙালিদের জন্য প্রীতিকর হয়নি। কেননা শায়েস্তা খাঁ ও তাঁর অনুচরদের শোষণ নীতি এবং সম্রাট শাহ্জাহানের পুত্রদের মধ্যে আত্মকলহে বাংলার আকাশ-বাতাস ধূমায়িত হ'য়ে ওঠে। যারদরুণ বাংলাদেশ ও বাঙালি তার স্বাভাবিকত্ব হাড়িয়ে ফেলে। এর কিছুকাল পরে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়িয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে দেশের সাহিত্য নতুন জীবন লাভ করে। বৈষ্ণব পদকর্তা চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গেবিন্দদাস ও বলরামদাসের আবির্ভাবে বাংলা কাব্য সাহিত্যের অপরূপ বিকাশ সম্ভব হয়। এবং বাংলা লোক-সংস্কৃতি, লোক-গীতি এবং লোক-সাহিত্যের ধারাও বিকাশ লাভ করে। মোটকথা এই আন্ত্য-মধ্যযুগেই বাংলাদেশ সাহিত্য সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠে। এবং বাঙালি একটু স্বস্তি লাভ করে।()

পলাশীর যুদ্ধ-বাঙালির পরাজয় :–

১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন সকাল ৮ ঘটিকায় পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধের দামামা, অশ্বের হ্রেষা, অসির ঝন্ঝনানি ও পদাতিক সৈন্যদের হুঙ্কারে পলাশীর আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হ'য়ে উঠলো। ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয় অনিবার্য দেখে বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর (মীর জাফর আলী খাঁন), তাঁরই দোসর ইয়ার লতিফ, রাজা রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ ও জগৎ শেঠ প্রমুখ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শণ করলো। বাঙালির সুনিশ্চিৎ জয়, পরাজয়ে পর্যবশিত হ'লো।(ঢাকার ইতিহাস দেখতে হবে) বাংলার নবাব সিরাজ বন্দী ও নিহত হ'লেন এবং তাঁর মাতা, ভ্রাতা, খালা ও অন্যান্য অনেক আত্মীয় স্বজনদের গঙ্গার অতল জলে ডুবিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হ'লো। লর্ড ক্লাইভের উপস্থিতিতে লুণ্ঠিত হ'লো বাংলার ধনাগার, অধিকার করা হ'লো বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসন। মীর জাফর, মীরণের লোকেরা, ইয়ার লতিপ, রায়দুর্লভ, রায়চাঁদ, উমিচাঁদ, নবকৃষ্ণ সবাই বাংলার সম্পদ কুক্ষিগত ক'রে রাতারাতি কোটিপতি ব'নে গেলো। বাংলা ও বাঙালির ভাগ্যাকাশে নেমে এ'লো অমানিশার ঘোর অন্ধকার। ইংরেজ ও ইংরেজদের পোষ্যদের চরম অত্যাচারে বাঙালি অতিষ্ট হ'য়ে বেঁছে নিলো সন্ত্রাসবাদ। ইংরেজরাও সনাতন ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করলো। বিদ্রোহীদের প্রবল আক্রমণে বাংলার বাতাস এমনই ধূমায়িত হ'য়ে উঠলো, যা পুলিশ, মিলিটারীর অকথ্য নির্যাতন, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, সম্পত্তি বাজেয়প্ত করণ অপর পক্ষে ইংরেজের তাবেদারদের অজস্র অর্থ, খেতাব , উচ্চপদ, জমীদারী, তালুকদারী দান কিছুতেই বাংলার বিদ্রোহ ও অসন্তোষ দূর করতে পারলো না। সারা ভারত এক মহামিছিলের পদভারে প্রকম্পিত হ'য়ে উঠলো। এর পর শত বছর ধ'রে চললো বাংলার বুকে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ। বক্সারের যুদ্ধ, কাটোয়া, গিরিয়া, উধুয়ানালা, পাটনা ও শোনের যুদ্ধ। বিশ্বাসঘাতক বাঙালি জমীদার, জোতদার, তালুকদার ও তাবেদারদের সহায়তায় ইংরেজরা এসব ছোট ছোট যুদ্ধে বাঙালিদের পরাজিত ক'রে বিজয় পতাকা উড্ডীন করলো। এর পরও বাঙালিরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করেই চললো। সারা দেশ বিদ্রোহ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। শান্তিপুরে তাঁতীদের বিদ্রোহ, মেদিনীপুরে মলঙ্গী ও চোয়াড় বিদ্রোহ, ইংরেজ কোম্পানীর অনুচর দেবী সিংহের বিরুদ্ধে রংপুর ও দিনাজপুরে কৃষক বিদ্রোহ, উত্তর বঙ্গে সন্ন্যাসী ও ফকীর বিদ্রোহ, বাঁকুড়ায় প্রজা বিদ্রোহ, তিতুমীরের নেতৃত্বে ওহাবী আন্দোলন ও সশস্ত্র যুদ্ধ, পাগল বিদ্রোহ, হাজং বিদ্রোহ, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন এবং সর্বশেষ ভারতব্যাপী সিপাহী বিপ্লব ও প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

সিপাহী বিদ্রোহ-বাঙালির পরাজয় :-

পলাশী যুদ্ধের ঠিক এক'শ বছর পরে উপমহাদেশে সত্যিকার সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় ১৮৫৭ সালে। ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেয় ইংরেজদের অধীনস্ত মুক্তিকামী হিন্দু-মুসলমান দেশীয় সিপাহীরা। তাঁদের সেই ঐতিহাসিক জীবন-সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানান ইংরেজদের দ্বারা অত্যাচারিত নিপীড়িত জমীদার-মহাজন, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনসাধারণ এমন কি মৌলবী ও পুরোহিতগণ। কিন্তু তা যা-ই হোক না কেন, এ সংগ্রাম নিতান্তই কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থী সিপাহীদের ঝুকিপূর্ণ তৎপরতা ছিলো তা বললে অত্যুক্তি হবে না। এ সংগ্রাম কোনো সুসংবদ্ধ সংগ্রাম ছিলো না। কেননা এতো বড় এ সংগ্রামে কোনো নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট নেতা ছিলেন না। কোনো সুপরিকল্পনা ছিলো না। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, যুদ্ধকান্ড যেমনই কুটিল তেমনি জটিল। সাধারণ মানুষের জান-মাল রক্ষা এবং খাদ্য-সামগ্রি ও ওষুধ-পথ্যের সংরক্ষণ, প্রয়োজনীয় গোলা-বারুদের সরবরাহ ইত্যাদি এবং যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য কন্ট্রোলরুম ও সংবাদ সরবরাহ সংস্থা। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধে এসব কিছুই ছিলো না। যারদরুণ একই সাথে একই সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী সিপাহীগণ ঝাপিয়ে পড়তে পারেনি। যুদ্ধ হয়েছে খন্ড খন্ড ভাবে। সুতরাং ইংরেজদের সুসংবদ্ধ সৈন্যদের সাথে ভারতীয় সৈন্যরা কোথাও এঁটে উঠতে সক্ষম হননি। দিল্লীর মসনদ অধিকার করলেও তা ৬'মাসের বেশী নিজেদের অধীকারে রাখতে সমর্থ হন নি। চিটাগাং-এ বিদ্রোহ হ'লো কিন্তু ঢাকার সিপাহীগণ ঠিক সময়ে জানতে পারলো না। যারদরুণ ইংরেজ সৈন্যরা ঢাকার সিপাহীদের নিরস্ত্র ক'রে তাদের বন্দী করতে সক্ষম হ'লো। কিছু সংখ্যক সিপাহী পালাতে সক্ষম হ'লেও তাঁদের কোনো গন্তব্য স্থানের ঠিকানা না থাকাতে বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও রোগভোগে অধিকাংশ মৃত্যুবরণ করলো এবং অবশিষ্ট যারা জীবিত ছিলো তারা ইংরেজ-পুষ্ট জমীদারদের সৈন্য দ্বারা এবং শ্রীহট্টের রাজার সৈন্য দ্বারা কচুকাটা হ'য়ে মৃত্যুবরণ করলো। এদিকে ইংরেজরা ঢাকার বন্দী সিপাহীদের পায়ে দড়ি বেঁধে বর্তমান পুরাতন ঢাকার বাহাদুরশা পার্কের বড়-বড় গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিলো। এই বাহাদুরশা পার্ক তৎকালে জঙ্গলে ঘেরা ছিলো এবং এর নাম ছিলো "আন্ডাঘরের ময়দান" এবং পরবর্তিতে এর নাম হয় "ভিক্টোরীয়া পার্ক।"এছিলো ইংরেজদের নজিরবিহীন পাশবিকতা। পরিকল্পনার অভাব হেতু অনেকেই এ বিদ্রোহ সম্বন্ধে অবহিত ছিলো না। যারদরুণ শিখ সৈন্যরা বিদ্রোহী সিপাহীদের পক্ষ সমর্থন না ক'রে ইংরেজদের পক্ষ সমর্থন ক'রে বিদ্রোহীদের কচুকাটা ক'রে ফেলে। ইংরেজের অনুরোধে নেপাল রাজ জঙ্গ বাহাদুর অনুপ্রবেশকারী বিদ্রোহী সৈন্যদের সমূলে নিমূল ক'রে ফেলে এবং কাশ্মীরের রাজা গোপাল শিংও ইংরেজের পক্ষ সমর্থন করেন। এক কথায় এসব বিদ্রোহীরা কোথাও এতোটুকু অনুকম্পা বা আশ্রয় পায় নি। নিম্ন লিখিত দু'টো উদাহরণেই সিপাহী যুদ্ধের হঠকারীতা ও নৃসংসতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে। যেমন,

(ক) ১৮৫৩ সালে ইংরেজ সরকার "এনফিল্ড"নামে এক ধরনের নতুন রাইফেল আমদানী ক'রে ভারতবর্ষে। দেশীয় হিন্দু মুসলমান সিপাহীদের ব্যবহার করতে দেওয়া হয় সে রাইফেল। এতে ব্যবহার করার জন্যে বিলেত থেকে পাঠানো হয় চর্বিমাখা কার্তুজ। রাইফেলে ঢোকানোর আগে দাঁতে ছিঁড়তে হ'তো কার্তুজের চর্বি অংশটুকু। আপত্তি করার কোনো কারণ ছিলো না দেশীয় সিপাহীদের। কিন্তু একদিন ঘটলো এক অঘটন। ব্যারাকপুর সেনানিবাসে হঠাৎ একদিন এক ফকির এসে গোপনে ব'লে গেলেন, হিন্দু-মুসলমান সিপাহীদের জাত মারার জন্যে ইংরেজ সরকার চর্বিমাখা কার্তুজ প্রচলন করেছে। শূকর আর গরুর চর্বি মাখানো হয় ঐ কার্তুজে। তোমরা আর ঐ কার্তুজ ব্যবহার করবে না। আপত্তি জানাবে। দরকার হ'লে বিদ্রোহ করবে। ফকির চলে গেলে কথা ছড়িয়ে পড়লো সিপাহীদের মধ্যে। মঙ্গল পান্ডে নামক একজন ব্রাহ্মণ সিপাহী প্রচার করলো খবরটা। সিপাহীরা ক্ষেপে গেলো। এর সত্যতা জানতে চাইলে, ইংরেজ সরকারের তরফ থেকে এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হ'লো। এ ফকির যে, কে ছিলেন তা কোনো দিনই কেহ জানতে পারেনি। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিলো। এই নেক্কার জনক কান কথাই পরবর্তিতে ঐতিহাসিক সিপাহী যুদ্ধে মোড় নেয়।

(খ) সে আমলের প্রখ্যাত সাংবাদিক উইলিয়াম রাসেল ইংরেজ অফিসারদের অমানবিক নৃশংসতার কাহিনী বিবৃত করেছেন তাঁর "ডায়েরী অব ইন্ডিয়া" গ্রন্থে। একস্থানে তিনি বলেছেন, "একজন সামরিক অফিসারের সাথে আজ আমার আলাপ হ'লো। তিনি মেজর রেনোনের অধস্তন কর্মচারী। তিনি গর্বের সাথে আমাকে জানালেন, স্থানীয়দের হত্যার ব্যাপারে আমরা আপোষহীন। সামনে পেলেই হ'লো। বিচার-বিবেচনা ক'রে মারার সময় আমাদের নেই। নির্বিচারে হত্যা না করলে ওদের কমাবো কি ক'রে? আবার যদি বিদ্রোহ করে? এবার তো আমরা প্রাণে বেঁচে গেছি। জয়লাভ করেছি। পরবর্তীতে তা হবে না। ওরা আর ইরেজদের প্রতি

দয়া দেখাবে না। হত্যা করবে নির্বিবাদে। তাই আমরা খতম করেছি শক্তিবানদের। শক্ত-সমর্থ, তেজী-নির্ভীক আর শিক্ষিত-অশিক্ষিত দেশপ্রেমিকদের আমরা রাখবো না। গতকাল যখন রাস্তা দিয়ে কুচকাওয়াজ ক'রে আসছিলাম তখন বারোজন পথচারী মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলো। বুঝেছিলাম ওরা আমাদের ঘৃণা করছে। ইংরেজ বিদ্বেষ ওদের অন্তরে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা চলা বন্ধ ক'রে বন্দী করেছিলাম সেই হিংসুটে লোকগুলোকে। অন্যদের সামনেই গাছের ডালে তাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। গ্রামবাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলো। বিচার-সালিস ক'রে ওদের ফাঁসি দেওয়া যেতো না। সময়ও লাগতো যথেষ্ট। ওসব ঝামেলার মধ্যে আমরা আপাততঃ যাচ্ছি না। সন্দেহ হ'লেই হ'লো। গত দু'দিনে এইভাবে চলার পথেই বিয়াল্লিশ জনকে ফাঁসি দিয়েছি। এতো গেলো চলার পথের বিবরণ। মেজর রেনোন দিনশেষে যেখানে দলবল নিয়ে আস্তানা গাড়তেন তার আশপাশের গ্রামগুলোর অবস্থা হ'তো আরো করুণ ও হৃদয় বিদারক। সাথের লোকজন দিয়ে গ্রামগুলোকে তিনি ঘিরে ফেলতেন। গ্রামবাসীরা যাতে বেরুতে না পারে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতেন। তারপর আদেশ দিতেন আগুন জ্বালানোর। গ্রামগুলো পুড়ে ছাই না হওয়া পর্যন্ত এবং একটি প্রাণী জীবিত থাকা পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন অদূরে।"

বঙ্গ-ভঙ্গ বিরুদ্ধ ও স্বদেশী আন্দোলনঃ–

১৯০৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে গড়ে উঠে "অনুশীলন সমিতি" নামে প্রথম এক সন্ত্রাসী দল। ১৯০৫ সালে প্রশাসনীক সুবিধের অজুহাতে লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে ভঙ্গ ক'রে পদ্মা নদীকে সীমারেখা টেনে আসামকে পূর্ব-বঙ্গের সাথে জুড়ে দিয়ে নতুন প্রদেশের সৃষ্টি ক'রে ঢাকাকে এ প্রদেশের রাজধানী করা হয়। কিন্তু বাঙালিরা সেদিন এ বিভাগকে মেনে নেয় নি। তারা সম্মিলিতভাবে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে। শুরু হয় সন্ত্রাসী তৎপরতা। ১৯০৬ সালে অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর ভাই বারীন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে কলকাতায় গড়ে উঠে দ্বিতীয় সন্ত্রাসী দল "যুগান্তর গ্রুপ।" কবি গুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরও এ দলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরুদ্ধ আন্দোলন তখন ক্রমান্বয়ে স্বদেশী আন্দোলনে সম্প্রসারিত হয়। শুধু বঙ্গভঙ্গ রোধ করা নয় এদেশ থেকে ইংরেজ রাজত্বেরই অবসান ঘটাতে হবে। ১৯০৭ সালের মধ্যে সারা বাংলায় অনুশীলন দলের প্রায় পাঁচ'শ শাখা প্রতিষ্ঠিত হ'লো। শুরু হ'লো কিংসফোর্ড, ট্যাগার্ট, পেডি প্রমূখকে হত্যা এবং হত্যার প্রচেষ্টা। কিংসফোর্ড ছিলেন তখন বাংলার জজ। তিনি এই স্বদেশীদের বেত্রাঘাতের আদেশ দেন। ফলে স্বদেশী সংস্থা সিদ্ধান্ত নেয় তাঁকে হত্যার। কর্তৃপক্ষ ভীত হ'য়ে কিংসফোর্ডকে মজফ্ফরপুরে বদলী করে। " অনুশীলন" দলের সিদ্ধান্তে বালক ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য মজফ্ফরপুরে গমন করেন। রাতের অন্ধকারে কিংসফোর্ড তাঁর জুড়ি গাড়িতে ক্লাব থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় বোমা নিক্ষেপে সেই গাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু অতীব দঃখের বিষয় এই যে, সে গাড়িতে সেদিন কিংসফোর্ড ছিলেন না, ছিলেন উকিল কেনেডির স্ত্রী ও কণ্যা। তাঁরা দু'জনই নিহত হন। প্রফুল্ল চাকী পালাবার উপায় না দেখে নিজের রিভল্ভারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরাম বসু ধরা পরেন এবং ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই ফাঁসি বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয় এক অপূর্ব ভাবাবেগ, কান্নার সঙ্গে একটি গর্ব, হারানোর সঙ্গে একটি প্রাপ্তি। তাই বাংলার মানুষের কণ্ঠে কেঁদে ফেরে সেই বীরত্ব গাঁথা "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি"। এমনিভাবে ব'য়ে চললো সন্ত্রাসবাদ। নিহত হ'লেন কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং এর ইংরেজ বড় সাহেব। দিনের বেলায়, বিষেভাবে সংরক্ষিত এলাকায় তাঁর নিজস্ব চেম্বারে নিহত হ'লেন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডী। নিহত হ'লেন কলকাতার মেছোবাজার বোমা মামলার রহস্যভেদী পুলিশ অফিসার এস, এন, চ্যাটার্জী। এমনি আরও কতো। ইতিমধ্যে দুর্বার এই আন্দোলনের ফলে বিভক্ত বাংলাকে জোড়া দিতে বাধ্য হ'লো বৃটিশ সরকার।

বাঙালির তৃতীয় বিজয়ঃ–

১৯৭০ সালের ৭ই ও ১৭ই ডিসেম্বার তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হ'লো এবং অত্যান্ত শান্তিপূর্ণ- ভাবে ভোট গণনা সম্পন্ন হ'লো। বাংলার জনগণের প্রাণ প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করলেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিকবাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খাঁন সহ বিশ্বের সকল নেতৃবর্গ তাঁকে অভিনন্দন ও স্বাগতঃ জানালেন এবং এ-ও ঘোষণা করা হ'লো যে শেখ মুজিবুর রহমান নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে সরকার গঠন করবেন। কিন্তু নিয়োতির কি নির্মম পরিহাস! এ-সময়ে স্মরনাতীতকালের সবচাইতে মারাত্মক এক ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলার নিম্নাঞ্চল-চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল ও দ্বীপাঞ্চলের প্রায় ১৫ লক্ষ পক্ষান্তরে ৩০ লক্ষ লোক শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করলো। এবং এ-অঞ্চলের ঘরবাড়ি, মালামাল সবকিছু স্রোতের টানে সমুদ্রের ভেলায় পরিণত হ'লো। আবহাওয়া অফিসের লজ্জাজনক ও নেক্কারজনক অবহেলার জন্যই এতোলোকের

প্রাণহানি ঘটলো। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হ'য়ে চললো ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো চেষ্টা করা হ'লো না। বরং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঠেকিয়ে রাখারই প্রচেষ্টা চললো। অবশেষে ৩রা মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে বলে ঘোষণা করা হ'লো। এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক সদস্য ঢাকায় এসে উপস্থিত হ'লেন। এদিকে ক্ষমতা লোভী ভুট্টোর অন্তর্দাহ দাবানলের ন্যায় দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। তিনি দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন যে, তিনি এবং তাঁর দল এ-অধিবেষনে যোগ দিবে না। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো সদস্য এ'তে অংশগ্রহণ করেন তবে আইন সভা কষাইখানায় পরিণত হবে। যোগদানকারী কোনো সদস্যকে পশ্চিম পাকিস্তানে জীবিতাবস্তায় ফিরতে দেওয়া হবে না। ইয়াহিয়াও ভুট্টোর সুরে সুর মিলিয়ে অধিবেষনের তারিখ পিছিয়ে দিয়ে ২৫শে মার্চ করলেন এবং সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, যদি কেহ পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখন্ডতা বিনষ্ট করতে চায়, তা কোনো ক্রমেই বরদাস্ত করা হবে না, সমুচিত শাস্তির ব্যাবস্থা করা হবে।

এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে বাংলার জনগণ ক্ষিপ্ত হ'য়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। নানারূপ শ্লোগান ও বিক্ষোভ মিছিলে বাংলার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হ'য়ে উঠে। গুলি চলে, অকুতোভয় বাঙালির বুকের রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলা মায়ের বুক। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দানে জনতার ঢল নেমে এ'লো। জনসমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলার লৌহ-মানব শেখ মুজিবুর রহমান হুশিয়ারী উচ্চারণ করলেন, "আর যদি আমার লোকের ওপর একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়,–ভাল হবে না। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে ফিরে যাও, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা তোমরা ক'রো না। সাতকোটি বাঙালিকে তোমরা দাবিয়ে রাখতে পারবা না।" জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "তোমাদের যাকিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুল। আজ হ'তে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইনু আদালত, অফিস বন্ধ ক'রে দাও। রেল চলবে .....। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।" বাঙালির সংগ্রাম চলতেই থাকলো, বাঙালির বুকের রক্তে রাজপথ রাঙা হ'য়ে গেলো। তার পর পর এ'লো ২৫শে মার্চের সেই কালো রাত্রি। ভুট্টো, ইয়াহিয়ার বাঙালি নিধন যজ্ঞ। রাত ১২টায় নিরীহ ঘুমন্ত বাঙালির ওপর ট্যাঙ্ক, মর্টার ও ম্যাশিন গানের গুলি। নিরীহ বাঙালি ঘুম থেকে জেগে উঠেই ম্যাশিন গানের গুলিতে পুনরায় চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো। আবালবৃদ্ধবনিতার ক্রন্দন রোল রাতের গভিরতা ভেদ ক'রে খোদার আরশে যেয়ে ধাক্কা দিয়ে খোদার আরশ কাঁপিয়ে তুললো। শহরের বসতি গুলিতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ম্যাশিন গানের গুলিতে বাঙালিদের পশুর মতো হত্যা করা হ'লো। তারপর চললো ধরপাকর, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন। বৈদেশীক সাংবাদিকদের পাঠানো সংবাদের শিরনামে দেখা গেলো পাকিস্তানী আর্মিরা বাঙালিদের তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্ববিবেক সেদিন লজ্জায় মস্তক অবনত করেছিলো।

এক কোটি বাঙালি সেদিন ভারতে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচালো। আর ছ'কোটি বাঙালির জীবন নিয়ে চললো ছিনিমিনি ও রক্তের হোলি খেলা। কুখ্যাত আলবদর, আলসামস ও রাজাকাররা বাঙালি নিধনে মেতে উঠলো। তারা স্কুল,কলেজ ও ইউনিভাসিটির ছাত্রীদের ধ'রে নিয়ে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে রেখে তাঁদের ওপর পাশবিক অত্যাচার শুরু করলো। অসহায় মা-বোনরা এই নারকীয় নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের শাড়ি গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করতে শুরু করলেন। তখন পিশাচের দল মা-বোনদের বস্ত্র কেড়ে নিয়ে বিবস্ত্র অবস্থায় তাঁদেরকে বন্দী ক'রে রাখলো। সোনার বাংলা চিরদিনই নারী সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। বিশেষ ক'রে তাঁদের আজানু-বিলম্বিত মেঘ-বরণ কেশ-ধাম। তখন অসহায় মাতা-ভগ্নিরা তাঁদের সেই সুদীর্ঘ কেশরাশি কণ্ঠে জড়িয়ে উদ্বোন্ধনে আত্মহত্যা ক'রে নারকীয় যন্ত্রনার হাত হ'তে নিজেদের রক্ষা করলেন। তবু পাষাণদের হৃদয় এতোটুকুও বিগলিত হ'লো না। তারা নির্মমভাবে তাঁদের মাথার চুল কেটে আবদ্ধ ক'রে রেখে পাশবিক অত্যাচার অব্যাহত রাখলো। স্বাধীনতার পর এ-সব সর্বহারা মা-বোনদের মধ্যে যাঁরা বেচেঁ ছিলেন তাঁদের বীরাঙ্গনা উপাধিতে ভূষিত করা হ'লো। বাংলার বুদ্ধিজীবিদের ধ'রে নিয়ে তারা তাঁদের ওপর অকল্পনীয় অত্যাচার চলালো এবং রায়ের বাজার ও মিরপুরের বদ্ধভূমিতে তাঁদের তামাক কাটা ক'রে হত্যা করা হ'লো। ৬ই ডিসেম্বার ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান করলেন। ৭ই ডিসেম্বার মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমনে পাকিস্তানীদের সবকটা বিমান, জলযান এবং ট্যাঙ্ক ধ্বংস হ'য়ে গেলো। কয়েক দিনের মধ্যেই জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে তাদের পালাবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হ'য়ে গেলো। ১৬ই ডিসেম্বার বিকেল সাড়ে চারটায় নিয়াজি ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'লেন। বাংলার নয়নমুনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইহাই হ'লো বাঙালির তৃতীয় বিজয়।

উপসংহার

ঈশ্বর দর্পকারীর দর্প চূর্ণ করেন। অত্যাচারীকে তিনি কখনো ক্ষমা করেন না। এই নিরীহ বাঙালিদের ওপর যারাই অত্যাচার করেছে, নিরীহ মা-বোনদের ইজ্জত কেড়ে নিয়ে, তাদের অপমানিত করেছে, তারাই এ-পৃথিবীতে তার ফল ভোগ করেছে। নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণ থেকে সে শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিৎ।

(১) "বিনামেঘে বজ্রাঘাতে মীরণ অপমুত্যু বরণ করেন।

(২) ইংরেজদের হাতে পদে পদে অপদস্থ , লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত এবং জনসাধারণ কর্তৃক ধিকৃত হ'য়ে কুষ্ঠরোগে কয়েক বৎসর অশেষ যন্ত্রনা ভোগের পর মীর জাফরের মৃত্যু ঘটে।

(৩) উঁমি চাঁদ কপর্দকহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

(৪) মহারাজ নন্দ কুমার মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন।

(৫) মীর কাশিমের আদেশে বহু কোটীপতি জগৎ শেঠ ও মহারাজ স্বরূপ চাঁদ মুঙ্গেরে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রাণ বিসর্জণ দেন।

(৬) মোহাম্মদীবেগ উন্মাদ অবস্থায় কুপে ঝাপ দিয়ে আত্মাহুতি দেন।

(৭) ইয়ার লতিফ অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট হন।

(৮) রায়দুর্লভ কারাগারেই ভগ্নস্বাস্থ্য হ'য়ে মুত্যুবরণ করেন।

(৯) সর্প দংশনে দানিশ শাহের মুত্যু ঘটে।

(১০) লর্ড ক্লাইভ্ টেম্স্ নদীতে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

(১১) ওয়ারেন হেষ্টিংস মামলায় অভিযুক্ত হ'য়ে অপহৃত ধন দৌলত হারিয়ে অপরের দানে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

(১২) তারপর চক্রান্তকারী ও ক্ষমতালোভী ভুট্টো যিনি বাংলার ত্রিশ লক্ষ মানুষের শনিতে নিজের হাত রঞ্জিত ক'রে বিনা বিচারে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে মৃত্যুবরণ করেন।

(১৩) ইহাই শেষ নয়। পবিত্র গীতায় বর্নিত আছে, ঈশ্বর যাকে মারতে চান প্রথমই তার স্মৃতিভ্রংশ ঘটান। এই স্মৃতিভ্রংশ হ'তেই বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হ'তেই মানুষের বিনাশ ঘটে। তাই কালজয়ী বিয়োগান্তক নাটকের এক মহানায়কের বিভীষিকাময় মৃত্যু আমাদের সামনে মূর্ত হ'য়ে অনেক কিছুই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সহকারী পুস্তক:-

(ক) বাঙালি যুগে যুগে (প্রথম খন্ড) নাজির আহমদ।

(খ) স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী:- বদরওদ্দিন আহমদ।

(গ) সিপাহী যুদ্ধের ট্র্যাজেডী :- আনিস সিদ্দিকী।

সমাপ্ত